ভারতের উপজাতি জীবন

ভারতের দেশ ও জাতি গ্রন্থমালা

ভারতের উপজাতি জীবন

নির্মল কুমার বসু

অনুবাদক
ক্ষিতীশ রায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নিউ দিল্লী

সূচী

চিত্র সূচী

(একবর্ণ ফোটো চিত্র)

চিত্র সূচী

(বহুবর্ণ ফোটো-চিত্র)

স্বীকৃতি

ভারতের নৃতত্ত্বসমীক্ষা সংস্থার শ্রীসুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় লেখকের ধন্যবাদার্হ। নয়া দিল্লী জাতীয় প্রদর্শশালার ডক্টর শচীন রায়ের আনুকূল্যে পুস্তকটি বহু চিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হল। সেজন্য লেখক তাঁর নিকট বাধিত। প্রচ্ছদের ছবিটি পাওয়া গেছে ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরের সৌজন্যে।

অবতারণা

ভারতে আনুমানিক 29,879,249 জন উপজাতীয়ের বাস। তপঃশীল-ভুক্ত হলে কি হয়, এরা আমাদের স্বজন ও প্রতিবেশী। এই পুস্তকে আমি তাদের একটি পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। তারা কি ভাবে বসবাস ও জীবনধারণ করে, তাদের সমাজ-ব্যবস্থা কেমন, উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কত রকম উপায়ে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবন সুন্দর ও সমৃদ্ধ ক'রে তোলার চেষ্টা করে—পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে তার বিশদ বিবরণ দিতে চেয়েছি। পৃথিবীর কোথাও মানুষ কেবল উদর ভরণ করে তৃপ্ত থাকতে পারে না। জীবনযাপনের দিনগত সমস্যা কোথাও এমন উৎকট নয় যে প্রাণ ধারণের পরিধি থেকে সমাজবদ্ধ মানুষ একটু বেরিয়ে যেতে পারে না। অন্নচিন্তা অতিক্রম করে মানুষ যুগে যুগে কালে কালে মনন চিন্তন, এমন-কি, কল্পনার জগতেও অবাধে তার অভিযান চালায়। মর্ত্য-জীবনের শেষে যারা মৃত্যুর পরপারে প্রয়াণ করে, মানুষ নানারকম

স্মারণিক উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদেরও মনে রাখে ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মানুষ ভাবে পরলোক থেকে পূর্বপুরুষ ইহলোকের উত্তরপুরুষের সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত থাকেন। এইভাবে অতীত ও বর্তমান একত্র যুক্ত হয়ে অবিচ্ছিন্ন কালক্রমের সৃষ্টি করে মানুষের জীবনে।

সহায়-সম্বলের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও দেখা যায় বৃহত্তর সমাজের প্রশস্ত জীবনধারা থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগোষ্ঠীও প্রাণ-ধারণের তাগিদে নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি সাধ্য -অনুসারে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্‌ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তাদের সমাজ-ব্যবস্থা কিংবা প্রয়োগবিদ্যা যতই নিম্ন মানের হোক, জীবনযুদ্ধ থেকে কেউ রণাঙ্মুখ হতে চায় না। কেবল প্রাণধারণ করে নয়, মানসিক ও আত্মিক দিক থেকেও তারা আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করে নেয়, আপন আপন প্রবণতা অনুসারে শিল্পকলা কিংবা ধর্মবিশ্বাস উদ্‌ভাবন ক'রে। এইভাবে তারা নিজেদের চারিদিকে নিজস্ব একটি জগৎ রচনা করে নেয় ও নিজস্ব উপায়ে দেহ, মন ও আত্মার তুষ্টি সাধন করে। পাঠকদের সামনে আমরা উপজাতি-জীবনের এই-সমস্ত বিচিত্র দিক উদ্‌ঘাটিত করে দিতে চাই। তা হলে তাঁরা বুঝতে পারবেন দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে আমাদের উপজাতীয় প্রতিবেশীরা কত শক্তি, সাহস ও উদ্‌ভাবনী প্রতিভার পরিচয় নিত্য দিয়ে থাকেন। এ-ভাবে যদি তাদের চিনতে জানতে চেষ্টা করা হয়, তা হলে স্বাধীনতাপ্রিয় আদিবাসী ও উপজাতিদের নিয়ে কেবল উচ্ছ্বাস করা নয়— তাদের শ্রদ্ধা করতেও শেখা যায়।

উইলহালমুর স্টিফানস্‌সন নামধেয় একজন প্রখ্যাত উত্তর মেরু-অভিযানকারী বহু বৎসর এস্কিমোদের মধ্যে বসবাস করেছিলেন। সে আজ অনেক কাল আগের কথা। তিনি বলেছিলেন পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে, নেহাৎ বুদ্ধি-কৌশলে এস্কিমোরা যে জয়ী হতে পেরেছিল, এ তাদের কৃতিত্ব। অনুরূপ অবস্থায় যুরোপীয়েরা নিশ্চয় হার মানত এবং বস্তুতপক্ষে মেরু অঞ্চলে তাদের কেউ কেউ যে প্রাণ

হারায় নি এমন নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারী মরুভূমিতে যে অরণ্যবাসীরা থাকে— তাদের বিষয়েও অনুরূপ কথা বলা যেতে পারে, আমাদের দেশেও কোনো কোনো উপজাতি বহু বাধাবিপত্তি জয় করে টিঁকে আছে। যে শক্তি ও সাহসের উপর তাদের জীবনাদর্শ অথবা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, তার প্রতি মাথা আপনা হতেই শ্রদ্ধায় নত হতে বাধ্য— এমন-কি, বাহ্যত অধিকতর সমৃদ্ধ প্রতিবেশীদের তুলনায় তাদের সাংস্কৃতিক সামগ্রী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও।

কিন্তু এ-দেশীয় উপজাতিদের বিষয়ে আরো অনেক কিছু বলা যায়। এখানকার অধিকাংশ উপজাতি স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের প্রতিবেশী সমতলবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। যারা চাষবাস কিংবা নানারকম হাতের কাজ করে খেটে খায়, তাদের সঙ্গে উপজাতিদের যোগ অব্যাহতভাবে চলে আসছে— সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে। এই দুই মহাকাব্যে উপজাতীয়দের বলা হয়েছে 'জন'। রাম বনবাসে থাকতে যখন মধ্য প্রদেশের অরণ্যসংকুল অঞ্চলে পা দিলেন, উপজাতি-অধ্যুষিত এই অঞ্চল রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে 'জনস্থান' বলে। বৈদিক সাহিত্যেও এমন সব জাতির বর্ণনা আছে যারা আকৃতি-প্রকৃতিতে, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থায় সমতলবাসী কৃষক কিংবা পশুপালকদের অনুরূপ ছিল না। অথচ অনাদ্যন্ত কাল ধরে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল— কখনো বৈরিতায় কখনো মৈত্রীতে, মানুষে মানুষে এ-রকম নিরবচ্ছিন্ন যোগ থাকায়, ভাবতে সভ্যতার ইতিহাস এবং তার গতি প্রকৃতি বহু-বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে— এতে সন্দেহ নেই।

স্বাধীন ভারতের সংকল্প এই যে জাতিবর্ণধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয় যেন নিজের এবং দেশ ও দশের অবাধ উন্নতি সাধনে সকল প্রকার সুবিধা লাভ করে। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে দেশের সর্বক্ষেত্রে প্রগতি আনবার জন্য আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উপজাতীয়দের সঙ্গে দেশের অন্যান্য জনগণের পারস্পরিক সম্বন্ধে একটি বিরাট পরিবর্তনের

সূচনা হবে— এতে আর আশ্চর্য কি ! নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে আমরা এমন সব প্রশ্ন কিংবা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, যা সম্ভ নিরসন করার মতো মুষ্টিযোগ হয়তো আমাদের হাতে নেই। কিন্তু সমস্যা আছে ও থাকবে। উপজাতি-জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সে-সব প্রশ্ন এড়িয়ে যাব না, বর্তমানে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা নিয়েও আলোচনা করব।

উপজাতিদের কথা ভাবতে গিয়ে সচরাচর আমাদের চোখে যে রোমান্টিক ছবি ভেসে ওঠে, এ বইয়ে সে ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় নি, বরঞ্চ চেষ্টা হয়েছে সত্যের বাস্তব চেহারাটুকু তুলে ধরতে। আশা করা যায় এ-বই পাঠ করার পর পাঠক উপজাতি-জীবন সম্বন্ধে ততটুকু জ্ঞান বা দরদ অর্জন করবেন, যার ফলে সর্ব-ভারতীয় পরিস্থিতিতে উপজাতির স্থান নিয়ে তাঁর ধারণা স্পষ্টতর হবে। তা যদি সম্ভবপর হয়, একটা সময় আসবে যখন আমরা প্রাচীন কালের সমস্ত ক্রুটি বিচ্যুতি সবলে পরিহার করে আমাদের এই স্বাধীন ভারতে নূতন একটি সমাজ ও সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পারব।

উপজাতি-জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার আগে, উপজাতি বলতে আমরা কী বুঝি সেটা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার।

ভারতের সংবিধান অনুসারে বাংলা, হিন্দি, গুজরাতি, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি যোলোটি ভাষা ভারতের মুখ্য ভাষারূপে স্বীকৃত। মুখ্য ভাষা ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কথিত ভাষা আছে অসংখ্য, সেগুলিকে মোটামুটি চারটি অংশে বিভক্ত করা যায় : হিন্দ্-আর্যভাষাবলী, দ্রাবিড়-ভাষাবলী, ভোট-বর্মী বা কিরাত ভাষাবলী এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা নিষাদ ভাষাবলী। এ ছাড়াও আন্দামানের ওঙ্গে অথবা যারারার মতো এমন সব উপজাতিক ভাষাও আছে যার কুল বা গোত্র এখনো স্থির করা যায় নি। এই-সব ভাষায় কথা বলে দু কুড়ি - তিন কুড়ি থেকে দু-তিন লক্ষ লোক। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোনো

কোনো ভাষার নামের সঙ্গে ভাষাভাষীদের সংখ্যার একটা হিসাব দেওয়া গেল : আগারিয়া—98 ; ভিলি—1,682,825 ; বীরহোড়—590 ; গোণ্ডি—1,501,431 ; যুয়াং—15,795 ; কোন্ধ—1,68,027 ; কুরুখ (ওরাওঁ)—1,141,804 ; হো—6,48,359 ; মুণ্ডা—9,98,690 ; সাঁওতালী—32,47,058 ; টোডা—765 ; ত্রিপুরী—2,99,643 ইত্যাদি। এদের অধিকাংশ লোকই দ্বি-ভাষিক, কিন্তু ঘরের মধ্যে ও নিজেদের সমাজে এরা নিজেদের ভাষাতেই ভাব আদান প্রদান করে থাকে।

উপজাতীয়দের মধ্যে যে নৃতত্ত্ববিদেরা কাজ করেছেন তাঁদের মতে সমাজ-ব্যবস্থার দিক থেকেও এক উপজাতির সঙ্গে অন্য উপজাতির পার্থক্য বিস্তর। বিবাহ ব্যাপারে তারা নিজেদের সামাজিক আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচারবিচার মেনে চলে ; অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় গোষ্ঠীর সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে ; আঞ্চলিক ব্যাপারে যেমন বহিরঞ্চলের ব্যাপারেও তেমনি তারা নিজেদের মোড়ল কিংবা দলপতির বিধান সচরাচর মেনে চলতে অভ্যস্ত। মোটকথা, সামাজিক ব্যাপারে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক সত্তা তারা রক্ষা করে চলতে চায়। এই স্বতন্ত্র গোষ্ঠীবর্গ উপজাতি নামে পরিচিত। সংবিধানের তপঃশীলে এদের নাম ভুক্ত করা হয়েছে, কতকগুলি ব্যাপারে এদের বিশেষ সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য। সংবিধান-রচয়িতাদের আশা ও বিশ্বাস যে এর ফলে উপজাতীয়েরা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের রাষ্ট্রিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের মূল ধারার সঙ্গে একত্র যুক্ত হয়ে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে কদম মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে।

এতদ্দণ্ডেও, ভাষা ছাড়া অন্যান্য সব ব্যাপারে আর-পাঁচজনের সঙ্গে উপজাতীয়দের উৎকট কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। প্রতিবেশী কৃষক-কারিগর সমাজের সঙ্গে অর্থনৈতিক দিক থেকে উপজাতীয়দের (সামান্য ভগ্নাংশ বাদ দিলে) পার্থক্য এক প্রকার নেই বললেই হয়। জীবিকার অবলম্বন অর্থাৎ পেশার দিক থেকে শহরের সঙ্গে গ্রামের

তফাত যতখানি, উপজাতীয় অঞ্চলের সঙ্গে গ্রামের তফাত তুলনায় অনেক কম। তথাচ, যেহেতু উপজাতীয় গোষ্ঠীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে এবং অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় তারা কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন ও আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত, তপঃশীলী তালিকায় তাদের নাম ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারী আদমশুমার বিভাগের প্রকাশিত গ্রন্থে তপঃশীলভুক্ত উপজাতির মোট সংখ্যা 427।

উপজাতিদের নানারকম শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পূর্বেই বলেছি ভাষাগোষ্ঠী দিয়ে শ্রেণী নির্ণয় করা সব চেয়ে প্রশস্ত। পৃথক পৃথক ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেও ভাগ করা চলে। আরো এক ভাবে ভাগ করা যায়— সমাজ-দেহ থেকে তাদের অস্তিত্বের দূরত্ব পরিমাপ ক'রে। দেখা যায় এই বিচ্ছেদ ও পার্থক্যের ভিত্তিতেই উপজাতি সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তবে এভাবে শ্রেণীবিভাগ না করে একটি খুব সহজ উপায়ে উপজাতিগোষ্ঠী বিন্যাস করা যায় —তা হল তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রণালী অনুসারে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা এই ভাবেই শ্রেণী বা পর্যায় বিচার করতে চাই। অবশ্য সেইসঙ্গে জীবনধারণে বা জীবিকার ব্যাপারে যে-সকল মুখ্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হয়েছে— তারও উল্লেখ আমরা যথাস্থানে করতে ইচ্ছা করি।

উপজাতিদের জীবিকা বিষয়ে বলা এবং তাদের গৃহস্থালী অথবা আর্থিক জীবন সম্বন্ধে বলা—একই কথা। সেইসঙ্গে আমরা উপজাতি-গোষ্ঠীদের পরস্পর-সম্বন্ধ এবং মোটামুটিভাবে তাদের সমাজ, ধর্ম ও শিল্পকলা বিষয়েও অল্প কিছু বলব। জীবিকার কথা বলতে গেলে বৃত্তির প্রসঙ্গ আপনা থেকে এসে পড়বে। উপজাতিগোষ্ঠীদের কেউ কেউ জীবিকা অর্জন করে শিকার ক'রে, মাছ ধ'রে কিংবা বনের ফলমূল ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ ক'রে। কেউ কেউ জঙ্গল জ্বালিয়ে মাটি খুঁড়ে 'জুম' চাষ করে, কেউ চাষ করে লাঙলে গৃহপালিত পশু জুতে। কোনো কোনো উপজাতি যাযাবরের মতো বনে বাদাড়ে ছাগল ভেড়া গোরু মোষ চরিয়ে বেড়ায়। কেউ নিছক গতর খাটায়;

কেউ বা মাটি, কাঠ, ধাতু প্রভৃতি দিয়ে জিনিস গড়ে; কেউ হয় বাগিচার কুলি, আবার কেউ বা কলকারখানায় দিন মজুরী করে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা সেই-সব উপজাতিদের বিষয়ে বলব যারা পরিশ্রম বা বুদ্ধি-কৌশলের সাহায্যে কিছু উৎপাদন করে না, জীবনধারণের জন্য নিতান্তই প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে।

নিষাদ, ধীবর, আহরণকারী

মূল ভারত ভূভাগের বহু জাতি ও উপজাতি পাখি ও পশু শিকার করে, মাছ ধরে কিংবা বন থেকে ফলমূল ও অন্যান্য সামগ্রী আহরণ করে জীবনধারণের মোটা প্রয়োজনগুলি মেটায়। কিন্তু এদের মধ্যে কেউই জীবিকার জন্য এই-সব বৃত্তির উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল নয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আদিবাসীরা কিন্তু বেঁচে থাকে শিকার করে, মাছ ধরে কিংবা বনসম্পদ আহরণ করে। অপর কোনো জাতি বা উপজাতির সঙ্গে তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ নেই। একই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে এমন বিচ্ছিন্ন যে ছোটো আন্দামানের ওঙ্গেরা বড়ো আন্দামানের যারারা অথবা নর্থ সেন্টিনেল দ্বীপের প্রতিবেশী আন্দামানীদের ভাষা বুঝতে পারে না। এই-সব ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী নিজ নিজ অঞ্চলে যে-সব উপায় বা সংগতির সন্ধান পায় তাই দিয়ে নিজেদের জীবিকার সকল রকম প্রয়োজন নির্বাহ করে। প্রযুক্তির দিক থেকে তাদের

যন্ত্রপাতি কিংবা হাতিয়ার যতই নিরেস হোক-না কেন, সেগুলির ব্যবহারে তারা বিলক্ষণ বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করে থাকে।

আন্দামানীরা বেঁটেখাটো হলে কি হয় তাদের দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ সুঠাম। রঙ তাদের কালো এবং চুল কোঁকড়া। নৃতাত্ত্বিকরা বলেন মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব সুমাত্রার সেমাং জাতি এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উত্তর ভাগ লুজোনের আয়েটা জাতির মতো আন্দা-মানীরাও নিগ্রোবটু অর্থাৎ আফ্রিকার নেগ্রিটো পরিবারভুক্ত জাতি। শরীর গঠনে এদের পারস্পরিক সাদৃশ্য এই অনুমান সমর্থন করে। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে আন্দামানীরা খাদ্যসংগ্রহের ধান্দায় সচরাচর থাকে নদী কিংবা সমুদ্রের ধারে অথবা বনে জঙ্গলে— অর্থাৎ এমন সব জায়গায় যেখানে মাছ ধরা অথবা পশু-পাখি শিকার করার সুবিধা।

আন্দামানের বনে জঙ্গলে বৃহদাকার পশু কিংবা স্তন্যপায়ী মাংসাশী বর্গের জানোয়ার একেবারেই নেই। বন্য বরাহ আছে প্রচুর। আন্দামানীদের কাছে বরাহের মাংস ও চর্বি অতি উপাদেয় খাদ্য। কিছুকাল হয় সরকারী উদ্‌যোগে আন্দামানের কোনো কোনো দ্বীপে চিত্রল হরিণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রুত হারে তাদের বংশ-বৃদ্ধিও হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আন্দামানীরা হরিণ শিকারে একেবারেই পরাঙ্মুখ। কয়েক বছব আগে পোর্ট ব্লেয়ারের বাসিন্দারা ভুল করে দু-জন যারারা যুবককে কয়েক দিনের মেয়াদে হাজতে পোরে। হাজতবাসের সময় তাদের খাওয়ার জন্য নানারকমের মাংস ধরে দেওয়া হয়। সকল রকম মায় হরিণের মাংস তারা একবার শুঁকেই ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু শুয়োরের মাংস সামনে ধরে দিতে তাদের আনন্দ দেখে কে!

কয়েক বছর আগে যারারা গোষ্ঠীর একটি বাড়ির অভ্যন্তরে ঢুকে সব-কিছু দেখার সুযোগ ঘটেছিল লেখকের। সে সময় তিনি লক্ষ্য করেন যারারাদের শিকার করা বন্য বরাহের অনেকগুলি খুলি পরিষ্কার ক'রে, বেতে-বোনা ফিতেয় গেঁথে মুণ্ডমালার মতো

সাফল্যের চিহ্নরূপে বাড়ির ভিতরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ছোটো আন্দামানের ওঙ্গেদের গোষ্ঠীগৃহেও অনুরূপ মুণ্ডমালা দেখা গিয়েছিল। শিকারে মৃত হরিণের সেরকম স্মৃতিচিহ্ন কোথাও দেখা যায় নি। একটি যারারা বাড়িতে এক দিকে মাথাঘষা একটিমাত্র হরিণের শিং চোখে পড়েছিল। যারারাদের অপর দুটি গোষ্ঠীগৃহে হরিণ-সম্পর্কিত কোনো চিহ্ন নজরে পড়ে নি।

আন্দামানীরা কদাচিৎ জাল ফেলে মাছ ধরে; সচরাচর তারা মাছ শিকার করে তীরধনুক কিংবা কোচ দিয়ে। সমুদ্রতীরে কোথাও প্রবালের প্রাচীর দেখা যায়। প্রাচীরের অন্তর্বর্তী জল অগভীর ও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ থাকায় ডোঙায় বসেই শিকারী মাছ কিংবা কাছিম স্পষ্ট দেখতে পায়। অতঃপর তীর কিংবা কোচ দিয়ে গেঁথে তোলা কষ্টকর হয় না। জনমানবহীন বালিয়াড়ির কোথায় কোথায় কচ্ছপের ডিম পর্যন্ত পাওয়া যাবে— সে তারা ভালো করেই জানে। চিংড়ি কাঁকড়ার মতো খোলাওয়ালা জলজ প্রাণীও আহারের জন্য আহরণ করা হয়। ওঙ্গেদের বেলা একটি অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়: আন্দামানে পাখিপাখালির অভাব নেই, কিন্তু মাংসের লোভে ওঙ্গেরা পাখি শিকার করে না। কেউ কেউ অনুমান করেন যে আন্দামানের ঘন জঙ্গলের ঝোপেঝাড়ে পাছে তীর হারিয়ে যায় সেই ভয়ে ওঙ্গেরা পাখি শিকার করতে চায় না।

বহিরাগতকে প্রতিহত করার জন্য যারারারা কখনো কখনো যে-তীর ছোঁড়ে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোনোপ্রকার শক্ত কাঠে সেই তীরের ফলা তৈরি। কিন্তু লোহার ফলা ব্যবহারে তাদের যে অনাগ্রহ আছে এমন নয়। সম্প্রতি চাষবাস করে জীবিকানির্বাহ করার উদ্দেশ্যে যারা গ্রাম পত্তন করেছে, তাদের কাছ থেকে শোনা যায় যারারারা কখনো কখনো চুপিসাড়ে এসে এই-সব গ্রাম থেকে টুকরো-টাকরা লোহা তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। এমনও শোনা যায় যে আগে আগে কোনো ভাঙা জাহাজের

ধ্বংসাবশেষ দ্বীপপুঞ্জের তীরে এসে ঠেকলে, তা থেকে ধাতুজাতীয় যা-কিছু পাওয়া যেত যারারারা সযত্নে সংগ্রহ করত।

আন্দামানীরা মাছমাংস সেদ্ধ করে খায়, নুন না দিয়ে। যে-রান্নায় নুন দেওয়া হয়েছে এমন কোনো আহার্য তাদের কাছে ধরলে একটি বার চেখেই থু থু করে ফেলে দেয়। মধু তাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত তিনটি মাসের অধিকাংশ সময় তারা ঘুরে ঘুরে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে। 'টৌঙ্গি' বলে এক ধরনের গাছের পাতা চিবিয়ে সেই লালা তারা সারা গায়ে মাখে, তা হলে নাকি মৌমাছি তাদের গায়ে বসে না, হুল ফোটানো তো দূরের কথা।

1963 সালের ডিসেম্বর থেকে 1964 সালের জানুয়ারি— এই দু'মাস ধরে ভারতের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা ওঙ্গেদের আহার ও আহার্য নিয়ে একটা অনুসন্ধানের কাজ চালিয়েছিলেন।* তার ফলে অনেকগুলি তথ্য জানা গেছে। জনপ্রতি ওঙ্গেদের দৈনিক আহার্যের পরিমাণ 2·34 পাউণ্ড। এর মধ্যে থেকে শতকরা 76 ভাগ অর্থাৎ 1·78 পাউণ্ড প্রোটিনজাতীয় খাদ্য— শুয়োরের মাংস, মাছ, কাছিম, ডিম, কাঁকড়া অথবা শামুক জাতীয় প্রাণী ; কার্বোহাইড্রেট পর্যায়ের খাদ্যের পরিমাণ শতকরা 22·6 ভাগ অর্থাৎ 0·50 পাউণ্ড— এর মধ্যে আছে মূলজ অথবা কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ, আর আছে শতকরা 1·4 ভাগ অর্থাৎ 0·03 পাউণ্ড ফল ও মধু। পর্যাপ্ত শিকার পেলে এক-একজন ওঙ্গে দৈনিক 6 থেকে 7 পাউণ্ড পর্যন্ত খেয়ে থাকে, তারপর পুনরায় খিদে না পাওয়া পর্যন্ত এক কিংবা একাধিক দিন তারা উপোস দেয়। আহার্য না জুটলে একাদিক্রমে দু-তিন দিন তারা উপোস দিতে পারে। সেদিক থেকে ছোটোনাগপুরের বৃহদাকার স্তন্যপায়ী মাংসাশী জন্তুর সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে।

* Saradindu Bose, "Economy of the Onge of Little Andaman", *Man In India*, vol. 44, no. 4, 1964, pp. 298-310.

আহার গ্রহণে তাদের অপর একটি চিত্তাকর্ষী বৈশিষ্ট্য আছে। সমীক্ষা চলার সময়ে দেখা যায় একটি গ্রামের জনসংখ্যা 16 থেকে 60-এর মধ্যে ওঠা-নামা করছিল ও অপর একটি গ্রামে 41 থেকে 102-এর মধ্যে। দুটি গ্রামেই হাজির হত যারা তাদের সবাইকে নিয়ে ভোজ হত— তা আহার্যবস্তু পরিমাণে যেমনই হোক-না কেন। কাউকে বঞ্চিত করা হত না, সমবেত ভোজে কে কে যোগ দেবে কিংবা কে কতটা খাবে তা নিয়ে কখনো কোনো ঝগড়াঝাঁটি দেখা যায় নি। সবটুকু আহার্য যেন সকলের এবং প্রত্যেকে খেত যে-যতটা পারে।

সারা পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে খুব কমই গোষ্ঠী আছে যারা আগুন কী ভাবে উৎপাদন করতে হয় জানে না, অথচ আগুন ব্যবহার করে। আন্দামানীরা এই মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যে দেশে গড়পড়তা বার্ষিক বৃষ্টিপাত 150 ইঞ্চি এবং যেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা ঘাসপাতায় ছাওয়া কুড়েঘরে বসবাস করে, সেখানে আগুন রক্ষা করা কত শক্ত তা সহজেই অনুমেয়।

আন্দামানীদের মাটির বাসন নেই বললেই হয়, কাঠ কুঁদে গর্ত বানিয়ে তারা ডোঙার মতো পাত্র প্রস্তুত করে থাকে। বাঁশ ও বেত দিয়ে তারা ঝুড়ি বানাতে পারে চমৎকার। আজকাল সরকারী ব্যবস্থায় তাদের বিনা পয়সায় লোহার বালতি, অ্যালুমিনিয়ম পাত্র ও টিনের কেনেস্তারা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। যারারাদের বস্তির ধারে কাছে সরকারের লোক মাঝে মাঝে কুড়ুল ফেলে দিয়ে যায়। বহিরাগত কাউকে বস্তির ধারে কাছে দেখলেই যারারারা পালিয়ে আত্মগোপন করে থাকে সত্য, কিন্তু সরকারের দেওয়া কুড়ুল তারা কেমন কাজে লাগিয়ে থাকে তার প্রমাণ দেখা যায় যারারা বস্তির কাছাকাছি বিরাট বিরাট কাঠের গুঁড়ি দেখে।

এক মধু ও শুয়োরের চর্বি ছাড়া আন্দামানীরা কোনোরকম খাদ্যবস্তু সঞ্চয় করে রাখে কিনা আমরা ঠিক জানি না। তবে একবার একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। প্রবাল-প্রাচীর

অতিক্রম করে আমাদের নৌকা সমুদ্রতীরবর্তী একটি যারারা বস্তির নিকটবর্তী হতেই দেখা গেল বাসিন্দারা মুহূর্তে পিছনের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। বস্তিতে পা দিয়ে দেখি দুটি গাছের মাঝখানে মানুষপ্রমাণ উঁচু একটি বেতে বোনা দড়ি ঝুলছে এবং সেই দড়ি থেকে ঝুলছে দশ-বারোটি শংকরী মাছ। বুঝতে পারলাম নাড়িভুঁড়ি সমস্ত বের করে দিয়ে, চোখের ফুটোর মধ্যে দিয়ে বেতের দড়ি গেঁথে গেঁথে শুঁটকি করার জন্য মাছগুলি রোদ্দুরে দেওয়া হয়েছে। দেখা গেল শুঁটকি ইতিমধ্যেই শুকিয়ে প্রায় খটখটে হয়ে এসেছে। বেতের দড়িটা বাঁধা হয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে— যাতে সূর্যের তাপ এসে পুরোপুরি মাছের গায়ে এসে লাগে। আন্দামানীদের খাদ্য সঞ্চয় প্রসঙ্গে ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য।

1922 সালে প্রফেসর রেডক্লিফ-ব্রাউন বড়ো আন্দামানের ধ্বংসোন্মুখ উপজাতি বিষয়ে যে বই লিখেছিলেন* তার বাইরে আন্দামানীদের সামাজিক সংগঠন বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভাষার ভিত্তিতে এই উপজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিষয়ে নৃতাত্ত্বিকরা অবশ্য ওয়াকিবহাল আছেন। তাঁরা এটাও জানেন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের স্থানীয় উপদলগুলি শিকার কিংবা উৎসবের সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যে মিলিত না হয়— এমন নয়। আপন আপন বিশিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও এ-রকম প্রতিবেশী উপদলের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনেও কোনো বাধা নেই। গৃহ-পরিবার বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততিই হল সমাজ-দেহের সর্বনিম্ন পূর্ণ সংখ্যা। গোত্র বা গোষ্ঠী বলতে আমরা যা বুঝি, আন্দামানীদের মধ্যে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। স্থানীয় কয়েকটি উপদলের সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলা যেতে পারে। এই-সব গোষ্ঠীগুলি

*Radcliffe-Brown, A. R., *The Andaman Islanders*, 1948. The Free Press, Illinois. প্রথম প্রকাশ 1922।

নামে মাত্র গোষ্ঠীপতির অধীনে থাকে, গোষ্ঠীপতিদের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব গ্রামসমাজের মোড়লদের সঙ্গে তুলনীয় বলা যেতে পারে না।

রেডক্লিফ-ব্রাউন তাঁর নিজস্ব সমীক্ষার ভিত্তিতে লিখেছেন : "যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করে, তা হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সমুচিত প্রতিশোধ নিতে পারে। কেউ যদি সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয় তা হলে সে গোষ্ঠীর অন্য ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারায়। আন্দামানীদের ব্যক্তিগত অহমিকা প্রবল থাকায়, পাঁচজনের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হলে তাদের খুবই গায়ে লাগে। অনেক ক্ষেত্রে একবার মাথা হেঁট হলে লোকে দুষ্কৃতি থেকে বিরত থাকে। অপরাপর ব্যক্তিদের বেলা গোষ্ঠীর মুরুব্বী শ্রেণী স্ত্রী-পুরুষের প্রভাবের ফলে সমাজের শৃংখলা বহুল পরিমাণে বজায় থাকে।"—(পৃ. 52)

নাচ আন্দামানীদের বিশেষ প্রিয়। ছোটো আন্দামানে কোনো ভ্রমণকারী কিছু ভেট বা উপহার নিয়ে হাজির হলেই উপজাতি গোষ্ঠী সমবেত নৃত্যের মধ্যে দিয়ে তাঁদের আনন্দ বিধান করতে চায়। এরা কাপড়চোপড় বড় একটা পরে না— যদি না বহিরাগত কেউ এদের কাপড়চোপড় দেন। মেয়েদের পরনে থাকে কোমরে একটি ঘুন্‌সি— সামনের দিকে তার বাঁধা থাকে ফুলের মতো ফাঁপানো তন্তুজাতীয় কোনো উদ্ভিদের গুচ্ছ। কিন্তু সারা অঙ্গে জ্যামিতিক ধরনের নকশার উলকি কাটতে তাদের ভারি আনন্দ। এলা, গৈরিক কিংবা ছাই মাটির রঙ থুতু দিয়ে তরল ক'রে কিংবা চর্বি দিয়ে তৈলাক্ত ক'রে তারা এই-সব চিত্র-বিচিত্র উল্‌কি নানা রঙে রঞ্জিত করে।

নিষাদ, ধীবর ও আহরণকারী ছোটো আন্দামানের এই উপজাতি কতখানি জায়গা জুড়ে এবং কী সংখ্যায় আছে— সে-বিষয়ে সমীক্ষক শরদিন্দু বসু একটি তথ্য পেশ করেছেন। এই দ্বীপের আয়তন হবে 270 বর্গ মাইল।* 1964 সালে ওঙ্গেদের সংখ্যা ছিল 132। এই

*সর্বাধুনিক হিসাব থেকে জানা যায় যে আয়তন হল 282·4 বর্গ মাইল এবং প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা হল 0·52।

সংখ্যার সঙ্গে 10 কি 15 যোগ করতে হয়— এই অনুমানে যে গণনার সময় সব লোককে হয়তো পাওয়া যায় নি, কিছু লোক হয়তো দ্বীপের অন্যত্র শিকার প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত ছিল। যদি মোট জনসংখ্যা ধরা যায় 150, তা হলেও প্রতি বর্গ মাইলে ওঙ্গে থেকে থাকবে 0·56, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে পড়ে 1·8 বর্গ মাইল। এও লক্ষ্য করা গেছে দ্বীপের অভ্যন্তরে অরণ্য অঞ্চলে থাকলে কোনো একজন ওঙ্গে যদি বছরের মধ্যে 9 মাসের মতো আহার্য সংগ্রহ করতে পায়, তা হলে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে সে বছরের 12 মাস ধরেই যথেষ্ট আহার্য পেতে পারে। তার যদি তেমন বুদ্ধিকৌশল থাকে তা হলে অরণ্যের তুলনায় সমুদ্র থেকে অনেক বেশি খাদ্য সে পেতে পারে।

ক্ষেত্রান্তরী কৃষক

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যে দেশগুলি আছে তার মধ্যে আছে ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়পড়তা বছরে 100 ইঞ্চির চেয়েও বেশি। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে এই অঞ্চলের পাহাড়-পর্বতকে নাবালক বলা যায়। পাথর গলে গিয়ে মাটিতে পরিণত হবার জন্য এখানে খুব বেশি বৃষ্টিপাত কিংবা খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য পাহাড়-পর্বতগুলি গাছপালা লতাগুল্মে আচ্ছাদিত। অতি বৃষ্টিতে আর্দ্র এই-সব নাতিশীতোষ্ণ বনে জঙ্গলে একাধিক উপজাতি-গোষ্ঠী বসবাস করে। মূলতঃ এরা কৃষিজীবী। এদের চাষের পদ্ধতি খুবই সহজ ও সাদাসিধা। ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো উপজাতিদের মধ্যে এই ধরনের চাষ দেখা যায়। ভারতের বাইরে উত্তর ব্রহ্মদেশে, সুমাত্রা, বোর্নিও, নিউগিনি এবং আফ্রিকার কোনো জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলেও এই শাদামাটা ধরনের চাষ এখনো চালু আছে।

ভারতের যে-সব অঞ্চলে এরকম চাষের প্রচলন সেই-সব অঞ্চলের গ্রাম-সমাজ পাহাড় ও উপত্যকার মধ্য থেকে একটি কোনো স্থান চাষের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। প্রতি বছর সেই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ছোটো কোনো অংশ চাষের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এরকম চাষে লাঙ্গল কিংবা বলদের চলন নেই; কুঠার, গাঁইতি কিংবা মাটি খোঁড়ার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। শীতের শেষে পাহাড়ের গায়ে বা জঙ্গলে, চাষের জন্য বরাদ্দ জায়গাটুকু চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর ঝোপঝাড় গাছপালার নিচু ডাল দা কিংবা কুড়ুল দিয়ে কেটে নির্দিষ্ট জায়গাটুকু সাফ করা হয়। কাটা ডালপালা প্রভৃতি জমিতে ফেলে রেখে কিছুকাল রোদে শুকানো হয়। তারপর বর্ষার মুখে এই-সব কাঠকুটোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, শেকড়বাকর সুদ্ধ সব ঝোপঝাড় জ্বলতে থাকে। ক্ষেতের চার পাশে চাষীরা পাহারায় থাকে যাতে আগুন ছড়িয়ে দাবানলের সৃষ্টি না করে। আগুন নিবে গেলে যেখানে যেমন দরকার, পাতলা করে ছাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আগুনে আগাছা ও পোকামাকড় নিকাশ হয়, পাতা ও কাঠের ছাই জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। তারপর চাষীরা কোদাল কুড়ুল নিয়ে জমিতে একটির পর একটি গর্ত করে এবং গর্তের মধ্যে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে যায়, পায়ের আঙুল দিয়ে খোঁড়া মাটিটুকু দিয়ে গর্ত ভরে ও তারপর গোড়ালি দিয়ে গর্তের মুখ চেপে দেয়। বৃষ্টি শুরু হলে বীজ ফুলে ফেঁপে চারা হয়ে বেরোয়। যথাসময়ে শস্য পাকলে পর, কেটে ঘরে তোলে।

নাগাল্যাণ্ড কিংবা অরুণাচল প্রদেশে একই জমি বছরে একবার কিংবা পর পর দু বছর এইভাবে চাষ দেওয়া হয়ে থাকে। ওড়িশার মতো যে-সব অঞ্চলে লোকসংখ্যার অনুপাতে জমির পরিমাণ কম, পর পর তিন বছর ধরেও একই জমিতে চাষ দেবার পর আবার কয়েক বছর ফেলে রাখা হয় উর্বরতা পুনরুদ্ধারের জন্য। পুনরায় চাষের যোগ্য হতে তিন-চার বছর থেকে দশ বছর

কাল সময়ও লেগে যেতে পারে। সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে চাষীর প্রয়োজনের উপর কিংবা লোকসংখ্যা ও জমির পরিমাণের ইতরবিশেষের উপর।

এই ধরনের ক্ষেত্রান্তরী কৃষির অঞ্চল বিশেষে নানা নাম দেখা যায়। আসামে এই ধরনের চাষকে বলা হয় 'ঝুম' অথবা 'জুম'; ওড়িশায় বলে 'পোড়ু' 'দাহি' অথবা 'কামানা'; মধ্যপ্রদেশে বলে 'পেন্দা' ইত্যাদি। ইংরেজী ভাষায় এই ধরনের চাষের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'কেটে-পোড়ানো' (slash-and-burn) অথবা ক্ষেত্রান্তরী চাষ। যারা এই ধরনের চাষ করে তারা যে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এমন নয়। পুরুষানুক্রমে গ্রাম যে-জায়গায় পত্তন হয়েছিল সেই সেই জায়গাতেই থাকে। কেবল গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার প্রতি বছর আশেপাশের জঙ্গল একটু একটু করে কেটে চাষবাসের উপযোগী করে তোলে। বছরের পর বছর একই ক্ষেত তারা চাষ করে না, জমির উৎপাদিকা শক্তি যাতে হ্রাস না পায় সেই উদ্দেশ্যে একাধিক বছরের চষা জমি একাধিক বছর ধরে ফেলেও রাখে।

এই ধরনের চাষে অঞ্চল বিশেষে ফসলের তারতম্য হয়। নাগাল্যাণ্ডে 'জুম' চাষের মুখ্য ফসল জোয়ার, ভুট্টা কিংবা কার্পাস তুলো। এই-সব ফসল সেখানে প্রভূত জন্মায়। উত্তর কাছাড় এবং মিকির অঞ্চলে জন্মায় তুলো, পেঁপে এবং নানারকম শাকসবজি। দিমাসা কছারি উপজাতির মেয়েরা বাঁশ ও বেতের তৈরি প্রকাণ্ড ঝুড়িতে করে এই-সব শাকসবজি নিয়ে, পাহাড় ও জঙ্গল ভেঙে অনেকটা পথ হেঁটে লামডিং-এর হাটে বিক্রি করতে যায়। ঝুড়িটা ঝোলে পিঠের উপরে, ঝুড়ির দুটি কান যে-চওড়া বেতের চাটাইয়ের ফিতে-বাঁধা থাকে, সেই ফিতে চেপটে থাকে তাদের শক্ত কপালে। এ যেন এক ধরনের শাকসবজির ঝাঁপান। ওড়িশা কেওনঝর জেলার জুয়াংরা হাটে বিক্রি করার জন্য প্রথম বছর 'পোড়ু' ক্ষেতে তিল বোনে। প্রতিবেশী অঞ্চলের চাষী সম্প্রদায়

এই তিল কিনে নিয়ে তা থেকে ঘানিতে তেল নিষ্কাশন করে। দ্বিতীয় বছর পোড়ু ক্ষেতের উপরিভাগে ধান বোনে ও নাবাল জমিতে জোয়ার কিংবা ভুট্টা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের ফসলটা সচরাচর বাজারে বেচে না, নিজেদের খোরাকের জন্য বাড়িতে তুলে রাখে। বিহারের পশ্চিম পালামৌ জেলায় পাহাড় ও উপত্যকায় জুম প্রথায় ক্ষেত তৈরি করে সেখানকার উপজাতিরা 'রাম অড়হর' নামে একরকম ডালের চাষ করে। 'রাম অড়হর' প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং কাছাকাছি কৃষক সমাজে এ-ডালের চাহিদাও খুব।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে-সব উপজাতি ক্ষেত্রান্তরী চাষ করে, তারা উৎপন্ন ফসলের সবটুকু নিজেরা ব্যবহার করে না, কিছুটা হাটে বাজারে বেচে দেয়। মিকির ও নাগা পাহাড়ের তুলো, পালামৌর ডাল, দিমাসা কছারীর শাকসবজি, ত্রিপুরার রিয়াংদের তুলো বেশির ভাগই বিক্রি করা হয়। ফসল বেচে যে টাকা পাওয়া যায় তা খরচ করা হয় কাপড়, লোহা, তামাকপাতা, লবণ, চিনি ও চা কেনার জন্য। জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাবার পর ক্ষেতে যখন মোটা চাল কিংবা ভুট্টার ফসল ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না, চাষী তখন নিজের সংসারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সে ফসল মজুত রাখে।

ওড়িশার কেওন্ঝর অঞ্চলের একটি ঘটনার প্রসঙ্গ এখানে উপস্থিত করব— এ থেকে প্রমাণিত হবে ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে চাষ হলেও উপজাতীয় চাষীরা নিজেদের ভিটে ছেড়ে স্থানান্তরে নড়তে চায় না। দেশ স্বাধীন হবার পর একটা প্রস্তাব ওঠে যে গোণাশিকার মতো ঘিঞ্জি গ্রাম থেকে জুয়াংদের সরিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি খোলামেলা কোনো তল্লাটে নিয়ে যাওয়া হবে। গোণাশিকার জুয়াংরা নিজেদের গ্রামবস্তি ছেড়ে সরকারের বরাদ্দ করা নূতন জায়গায় উঠে গেল। বাড়িঘর তৈরি হল। আকস্মিক কারণে আগুন লেগে নূতন গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঠাঁইনড়া হবার অপরাধে দেবতারা তাদের উপর বিরূপ হয়েছেন— এই অজুহাতে জুয়াংরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল

তাদের পুরাতন ভিটেতে। তারা যে স্থানান্তরী একেবারে না হয় এমন নয়। মাঝে মাঝে তারা ঠাঁই বদল করে নূতন জায়গায় গ্রাম পত্তন করেছে দেখা গেছে। তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের তুলনায় ওড়িশার উপজাতি ঠাঁই বদল করে থাকে কালেভদ্রে।

ঝুম ক্ষেতের ফসল অনেক সময় হাটে বাজারে বিক্রি করা হয়—ইতিপূর্বে সে কথা বলেছি। কিন্তু এরকম বাড়তি রোজগার করেও উপজাতীয় ক্ষেত্রান্তরী কৃষক যখন আপন পরিবার ভরণপোষণে অসমর্থ হয়, তাকে উপার্জনে বেরোতে হয়। ওড়িশা পারলাকিমেডি অঞ্চলে সাওরা অথবা শবরদের মধ্যে এরকম চাকরির খোঁজে বেরোবার একটি ঘটনা লেখক প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একটি পোডু ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে মনে হল ক্ষেতের অবস্থাটা শোচনীয়—ছোটোবড়ো শিলাখণ্ড ইতস্তত ছড়ানো, তারই ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু মাটি পাওয়া গেছে তাতেই ঝুম প্রথার কিছু জোয়ার-বাজরা-মকাই জাতীয় ফসল লাগানো হয়েছে। পশুপাখিতে যাতে মুখ না দেয় সেইজন্য ছোটো একটি চালার নীচে বসে অল্পবয়সী একটি ছেলে ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে। বাপ-মা কোথায় জিজ্ঞেস করায় ছেলেটি বলল যে তার বাবা পাহাড়তলীর ম্যুনিসিপালিটি অফিসে কাজে লেগেছে এবং সেখানেই গেছে। মাইনে ভালোই পায় নিশ্চয় তা না হলে ক্ষেতী ছেড়ে চাকরিতে লাগবে কেন? আর-একটু খোঁজ নিয়ে জানা গেল পাহাড়-তলীর চাষীরা নাকি শবরদের ধরে কয়ে এবং হয়তো কিঞ্চিৎ ঘুষঘাস দিয়ে উপর পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায়। বর্ষাসমাগমে পোড়া জঙ্গলের গাদা গাদা ছাই ধুয়ে বৃষ্টির জল নামে নাবাল ক্ষেতগুলির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে।

এইভাবে বাজার হাটে ফসলের উঠতিপড়তি দরদামের সঙ্গে, পার্বত্য ও সমতলবাসী চাষীদের লেনদেনের সঙ্গে, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে ঝুম চাষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বাইরের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যেখানে চাহিদা-মাফিক শ্রম ও শ্রমজাত দ্রব্যের দাম বেঁধে দেওয়া হয় ঝুম চাষও ক্রমে ক্রমে তারই আওতায় পড়তে শুরু

করেছে। আন্দামানীদের পশু পাখি মাছ শিকার ও বনজাত জিনিস সংগ্রহে জীবিকার যে স্বাধীনতা তা বাজারদরের উপর নির্ভরশীল নয়। চাষবাসের অর্থনীতি নিয়েও তাদের মাথা ঘামাতে হয় না; কিন্তু পার্বত্য উপজাতীয়েরা ঝুম প্রথায় চাষের কাজ এখনো অব্যাহত চালিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে যে টুকরোটাকরা জমি থাকে, সে-জমি চাষের কাজে লাগাতে হলে ঝুম ছাড়া গতি নেই। পাহাড়ের গা কেটে কেটে স্তরে স্তরে কিংবা ধাপে ধাপে ক্ষেত তৈরি করা, এবং সেইরকম ক্ষেতে আল বেঁধে জল ধরে রেখে ধান বুনতে গেলে বহুলোকের সমবেত পরিশ্রমের প্রয়োজন। পাহাড়ে জঙ্গলে মুষ্টিমেয় যে-সব উপজাতি পরিবার থাকে তাদের পক্ষে এই ধরনের চাষের কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব।

এই অবসরে ওড়িশার জুয়াং ও শবর গোষ্ঠীর মধ্যে এবং আসামের নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরাম-নিবাসী-উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে, ঝুম চাষের বিষয়ে যে-সব প্রথা ও পদ্ধতি পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—সে বিষয়ে দু-চার কথা বলা দরকার। জুয়াং গ্রামে জমির মালিক হল গ্রাম-সমাজ। প্রতি বছর গ্রামের লোক একত্র হয়ে স্থির করে কোন্ জমিতে চাষ দেওয়া হবে। গাঁয়ের পুরুত মন্ত্র পড়ে পুজো-আর্চা করবার পর, গাঁয়ের মোড়ল একটি বাঁশের দণ্ড নিয়ে মেপে মেপে দেয় কোন্ পরিবার কোথায় কতটা জমি নিয়ে চাষ করবে। মানদণ্ডে মেপে দেওয়া জমিতে প্রতি পরিবার আপন পরিশ্রমে যে-ফসল উৎপন্ন করে, সে ফসলটুকু সেই পরিবারের, কিন্তু জমির মালিকানা থাকে সমগ্র গ্রাম-সমাজের।

দক্ষিণ ওড়িশার শবরদের মধ্যে সমবায় প্রথার চাষ করার রেওয়াজ আছে। প্রথমে স্থির হয় এক বছর কিংবা একাধিক বছরের জন্য পাহাড়ের গায়ে কোনো একটি অঞ্চলে পোডু চাষ দেওয়া হবে। গ্রামবাসীরা তখন একত্র হয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষের জমি খুঁড়ে, স্তরে স্তরে পাথরের টুকরো দিয়ে আল বাঁধে। আশে-পাশে যে-সব জলের প্রপাত বা ধারা থাকে বিশেষ বুদ্ধি খাটিয়ে

সেগুলি স্তর থেকে স্তরান্তরে চালনা করে আলবাঁধা ক্ষেতগুলিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে পোড়ু ক্ষেতকে ধান ক্ষেতে পরিণত করা হয়।

মিজোরামের উপজাতিদের মধ্যে আমেরিকার খ্রীস্টান মিশনারিদের বেশ প্রভাব দেখা যায়। এদের মধ্যে সাক্ষরতার হার যেমন বেশি তেমনি পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষের জমি তৈরি করাতেও এরা বেশ পাকা। চাষবাসের উন্নত প্রণালীও এরা কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে। গ্রামবাসীদের আহার্যে পুষ্টির অভাব পূরণের জন্য পার্বত্য মিজোরা প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু উৎপাদন করে।

ভারতের যে-সব অঞ্চলে এখনো ক্ষেত্রান্তরী চাষের প্রচলন আছে, সেগুলির মধ্যে তুলনামূলক সমীক্ষা চালালে বোঝা যেতে পারে ভিন্ন ভিন্ন জায়গার প্রকৃত সমস্যা কী, কেমন করেই বা তারা পরিবর্তমান পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

1961-63 সালে ভারতের নেতৃত্বসমীক্ষা ক্ষেত্রান্তরী প্রথায় জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন ফসলের প্রাণধারণ ক্ষমতার ইতরবিশেষ নিয়ে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। আসামের মিজো অঞ্চলে, ওড়িশার কেওনঝরে, মধ্যপ্রদেশের বাস্তার-অঞ্চলের আবুঝমার উপত্যকার— সবসুদ্ধ 112 বর্গমাইল ব্যাপী জায়গা ছিল এই পরীক্ষার ক্ষেত্র। আবহ, ভূগোল ও ভূতত্ত্বের দিক থেকে এই-সব অঞ্চলের পরস্পর পার্থক্য প্রচুর— একমাত্র চাষের পদ্ধতিতে এদের বিস্তর মিল এবং সেদিক থেকে এরা একপ্রকার অভিন্ন বলা যায়। মিজো পাহাড়ের জমির উদ্ভব হয়েছে সহজে চূর্ণ হয় এইরকম তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত পাললিক শিলা থেকে। কেওনঝর ও বাস্তার অঞ্চলের জমির উদ্ভব হয়ে থাকে সমান্তরাল স্তরবদ্ধ প্রাচীন শিলা ও তার অন্তর্বর্তী কেলাসিত এবং আগ্নেয় শিলা থেকে, এ-অঞ্চলে কিছু পাললিক শিলাও দেখা যায়। সমীক্ষার সময় ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার জমির গঠন ও উপাদানের তারতম্য সমীকরণের চেষ্টা বিফল হবে

মনে করে হিসাবের মধ্যে একপ্রকার নেওয়াই হয় নি। তবে বৃষ্টি-পাতের পার্থক্যটুকু হিসাবে ধরা হয়েছে— মিজো পার্বত্য অঞ্চলে বার্ষিক বারিপাত 130 ইঞ্চি, বাস্তার ও কেওনঝরে 50 থেকে 60 ইঞ্চি।

সমীক্ষা চালিয়েছিলেন শরদিন্দু বসু *— তাঁর সংগৃহীত তথ্য পর-পৃষ্ঠায় তালিকার আকারে তুলে দেওয়া হল। হিসাব করতে গিয়ে তিনি নিছক ঝুম চাষের ভিত্তিতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ ধরেছেন। ডিম, ফলমূল ও শাকসবজির মতো অনুপূরক খাদ্যবস্তুর পরিমাণ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হতে পারেন নি বলে, সেগুলির কোনো উল্লেখ করেন নি। দ্বিতীয়ত, সমীক্ষা যখন চলেছে ঠিক সেই সময়টা ছিল মিজোদের ফসল তোলার সময়। খাদ্যবস্তুর পরিমাণ অধিক থাকায় জনপ্রতি আহার্যের তাপমাত্রা বা ক্যালরির পরিমাণ ছিল দৈনিক 3,500। জমির উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ জমি আয়তন অনুপাতে কী পরিমাণ মানুষের খোরাক জোগাতে পারে, হিসাব করতে গিয়ে সমীক্ষক এই তাপমাত্রাকেই হিসাবের মাত্রারূপে ধরেছেন। 12 বছরের অনধিক বয়স্ক শিশুদের দুজনাকে ধরা হয়েছে একজন পূর্ণবয়স্কের সমান বলে।

তালিকাদৃষ্টে বোঝা যায় যে তালিকার অন্তর্গত সকল উপজাতিই যদিচ জীবিকার জন্য মূলতঃ ক্ষেত্রান্তরী চাষের উপর নির্ভরশীল, তাদের সকলের সমস্যা সমান নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মামপুই অঞ্চলে জনপ্রতি জমির পরিমাণ সুপ্রচুর, সৈরেপ অঞ্চলে তেমন নয়। শরদিন্দু বসু লক্ষ্য করেছেন সৈরেপ অঞ্চলের জঙ্গল পাতলা থাকায়, ঝুম প্রথায় চাষ করার জমি পরিমাণে খুবই কম। সেই কারণেই সৈরেপ অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের খাদ্যাভাব মেটাবার জন্য রাস্তাঘাট বানাবার জন খেটে দু-পয়সা রোজগার করে।

* Bose, Saradindu : *Carrying Capacity of Land under Shifting Cultivation*, The Asiatic Society, Calcutta 16

তালিকায় সমীক্ষার ফলাফল

অঞ্চল ও গ্রাম	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা	জন-হিসাবে প্রতি বর্গমাইলের খোরাকী
মিজোরাম পার্বত্য অঞ্চল		
মামপুই	6·72	42·6
সৈরেপ	19·62	32·4
মধ্যপ্রদেশ বাস্তার অঞ্চল (অবুঝমার উপত্যকা)		
বাটের বাটের	10·3	16·3
গুণ্ডাকোট	4·1	13·7
কোণ্ডাকোট	4·6	10·6
দাঁদরারাদা	12·2	16·7
ওড়িশার কেওনঝর অঞ্চল		
রাইদিহা	11·3	23·9
কদলীবাড়ি	80·9	27·4
হাতিশিলা	46·0	22·1

বাস্তার অঞ্চলেও জন-হিসাবে প্রতি বর্গমাইলের খোরাকীর পরিমাণ অল্প। কিন্তু রাস্তাঘাট বাজার হাট থেকে অবুঝমার উপত্যকার দূরত্বের ফলে, সেখানকার গোন্দ উপজাতিকে যথাসাধ্য বুদ্ধি ও পরিশ্রম খাটিয়ে জমি থেকে খাদ্যবস্তু আদায় করে নিতে হয় ও নিজেরা নিজেদের মতো জীবনযাপন করার কায়দা পুরুষানুক্রমে আয়ত্ত করে নিতে হয়।

এই দুই অঞ্চলের তুলনায় কেওনঝরে জুয়াংদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। সেখানে প্রতিবর্গমাইলে 24·7 জনের বেশি লোকের খোরাকী জোগানো সম্ভবপর নয়, সেখানে উক্ত পরিমাণ জমি থেকে 68 জন পূর্ণবয়স্ক লোকের খাদ্য সংস্থানের কথা জুয়াংদের ভাবতে

টোডা তরুণী

টোডা পণামেব ববন

টোডা বাসগৃহ

ওড়িশার যুয়াং দম্পতি

ঘুযাং নৃত্য

শিকারী যুযাং মৃগমাংস আগুনে ঝলসিযে নিচ্ছে

মধ্যপ্রদেশের বন্যমহিষশৃঙ্গী মারিয়া গোষ্ঠির তরুণ

বন্যমহিষশৃঙ্গী মারিয়া গোষ্ঠিভুক্ত যুবতী জননী

হয়। ফলে সে অঞ্চলে খাদ্যাভাব প্রচণ্ড এবং বেঁচে থাকার জন্য তাদের নানারকম উপায় সন্ধান করতে হয়। একেবারে প্রথম ধাপে খাদ্যশস্যের অনুপূরকরূপে জুয়াংরা জঙ্গল থেকে পাতা, ফল ও মূল সংগ্রহ করে। আম কাঁঠালের মরসুমে আম কাঁঠালের উপর মূলতঃ নির্ভর করতে হয় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। কেবল ফল নয় আঁটি কিংবা বিচিও বাদ যায় না। আমের আঁটি ভেঙে বীজ বের করে নিয়ে, সে বীজ রৌদ্রে শুকিয়ে নেবার পর শিল নোড়ার সাহায্যে ময়দার মতো মিহি করে গুঁড়িয়ে নেওয়া হয় এবং সে ময়দা অন্য কোনো আহার্যের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া হয়। কাঁঠাল বিচির তো কথাই নেই— গুঁড়িয়ে, সেদ্ধ করে, ভেজে— নানাভাবে তার উপযোগ করা চলে।

বেঁচে থাকার চেষ্টায় দ্বিতীয় ধাপে জুয়াংরা খাদ্যাভাবের তাড়নায় দেশান্তরী হয়— অর্থাৎ গ্রামের ভিটে ছেড়ে কিছু কিছু পরিবার বর্তমানে জনবসতি নেই পাহাড়ের উপরিভাগের এমন কোনো ঢালু অঞ্চলে, নূতন গ্রাম পত্তন ক'রে পুরাতন খেই ধরে আবার নূতন করে জীবনধারণের চেষ্টায় রত হয়। এইভাবে পণসনেশ নামে এক গাঁয়ের কিছু জুয়াং পরিবার নিজেদের ভিটে ছেড়ে প্রতিবেশী পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিয়ে বসবাস করতে থাকে। উপরিভাগে অবস্থিত বলে নূতন গ্রামের নাম হয় 'উপব' পণসনেশ, ছেড়ে-আসা পুরাতন আদি গ্রামের নাম দেওয়া হয় 'তল' পণসনেশ।

কিন্তু ধারেকাছে নূতন গ্রাম পত্তন করার মতো জায়গা তো সব সময় পাওয়া যায় না। আর যদিই বা পাওয়া গেল, এত উঁচুতে পাথর ভেঙে জঙ্গল পুড়িয়ে যে দু-চারটি 'পোড়ু' তৈরি করে গেল— তার ফসলে সবগুলি ভূখা পেট ভরানো হয়তো সম্ভব হয় না। গ্রামছাড়া হা-ঘরেরা তখন কী করে ? কেউ কেউ অন্য উপজাতীয়ের ক্ষেতে গিয়ে জনমজুর খাটে। মজুরী যৎসামান্য যা পায় তার উপরন্তু কিছু উপার্জনের চেষ্টায় জঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী—জ্বালানি কাঠ, মধু অথবা বিড়ি বাঁধার কেন্দু পাতা— আহরণ করে সেগুলি

হাটে বাজারে বেচতে যায়। আর যদি উপায়ান্তর না-ই থাকে এবং ঘরে যদি সঞ্চিত ধন কিছু থাকে, অথবা মহাজন দাদন দিতে রাজী হয়, তা হলে পুরুষানুক্রমিক 'পোড়ু' পদ্ধতির চাষ ছেড়ে দিয়ে, সমতলবর্তী অপেক্ষাকৃত সচ্ছল প্রতিবেশীদের দেখাদেখি বলদ জুড়ে হালচাষ শুরু করে দেয়। কিন্তু এরকম জুয়াংদের সংখ্যা অতি অল্প।

ওড়িশার ঢেনকানাল জেলায় বেশ কিছু জুয়াং পরিবার হাল-বলদ নিয়ে জমি চাষে প্রবৃত্ত হয়েছে। অপর পক্ষে কেওনঝর জেলায় গোণাশিকার উপরিভাগে সনাতন পোড়ু প্রথার চাষ এখনো চালু আছে দেখা যায়। সন্ধান নিলে দেখা যায় উপরিভাগের জুয়াং বস্তিতে যারা থাকে তারা সচরাচর একই পরিবার কিংবা গোষ্ঠীর লোক। সেই জুয়াংরাই যখন ঢেন্‌কানালের উপত্যকা অঞ্চলে নেমে এসে, সমতলবর্তী প্রতিবেশীদের ধরনে হাল-বলদ নিয়ে চাষ শুরু করে দেয়, সচরাচর দেখা যায় তাদের বংশবৃদ্ধি হয় পার্বত্য জুয়াংদের চাইতে দ্রুততর হারে। হাল-বলদ নিয়ে চাষ করলে জমি পতিত রাখা যায় না, একা হাতে চাষ করাও যায় না— সম্ভবত এই কারণে জন্মের হার বেড়ে যায়। পরিবার-বৃদ্ধির ফলে জুয়াং সমাজে আবার নবতর সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে।

ক্ষেত্রান্তরী উপজাতি সমাজে কাল ও অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে নানা রকম পরিবর্তন ঘটেছে— এ আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। উত্তর-পূর্বে কিংবা মধ্য প্রদেশে এমন কোনো গোষ্ঠী নেই যারা জীবিকার জন্য কেবল ক্ষেত্রান্তরী কৃষির উপর নির্ভরশীল। হাল-বলদ নিয়ে যারা চাষ করে কিংবা সুবিধে পেলে যারা জনমজুর খাটে, ঝুম, পোড়ু অথবা পোন্দা চাষ তাদের পক্ষে উপরি খোরাকের উপায় স্বরূপ। এই ধরনের চাষের ফসল হাটেবাজারে বেচা হয়। এইভাবে সমতলবর্তী চাষের পদ্ধতি পার্বত্য পদ্ধতিকে গ্রাস করছে— কারণ একটির উৎপাদন অন্যটির তুলনায় বেশি। সমতলবর্তী হিন্দুদের কৃষিপদ্ধতি স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের সমাজ-ব্যবস্থাও

কীভাবে উপজাতি সমাজে অনুপ্রবেশ করছে তার একটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া গেল।

ক্ষেত্রান্তরী প্রথা ছেড়ে দিয়ে যে-সব জুয়াং ঢেন্‌কানাল কিংবা কেওনঝর অঞ্চলে হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে লেগেছে, সম্প্রতি তাদের মধ্যে থেকে ভাসাভাসাভাবে হলেও নূতন একধরনের দাবি উঠতে শুরু করেছে। তারা চাইছে প্রতিবেশী সমাজ ও সরকার যেন আশেপাশের হিন্দু চাষীদের কোনো জাতের সঙ্গে তাদের সগোত্র বলে মেনে নেন। এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নৃতাত্ত্বিক নিত্যানন্দ পট্টনায়ক লক্ষ্য করেছেন তৈলিক-বৈশ্য অর্থাৎ তেলী এবং অপরাপর জাতের হিন্দু চাষীদের মতো জুয়াংরাও নিজেদের সমাজ-পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে লেগেছে। অন্য জাতের লোক যেমন পঞ্চায়েত বসিয়ে নিজেদের সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে, শিক্ষার উন্নতি ও আথিক উন্নতির জন্য সরকার বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করে আবেদন পাঠায়, জুয়াংরাও ঠিক তেমনটি করতে শুরু করেছে।

হিন্দু গ্রাম-সমাজের অন্যান্য যে-সব গোষ্ঠী খাদ্য-উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত তাদের অনুরূপ কাজ করার ফলে জুয়াংরা ক্রমেই হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত একটি নূতন জাতিরূপে পরিগণিত হতে চলেছে। হিন্দুদের দিক থেকে ধর্মান্তরকরণের কোনো চেষ্টা ব্যতিরেকেই এই রকম পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে বলে সমীক্ষায় প্রকাশ। কেওনঝরের গোণাশিকা অঞ্চলে বৈতরণী নদীর উৎসস্থান জুয়াংদের কাছে পবিত্র। বৈতরণী হিন্দুদের কাছেও পবিত্র বলে তার উৎসস্থান হিন্দুদেরও তীর্থ। ধর্মীয় দিক থেকে উভয়ের মধ্যে এই তীর্থ একটি যোগসূত্রের মতো। অপর পক্ষে জাতি-নির্ভর হিন্দু সমাজের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে প্রভাবিত হওয়ায় আথিক দিক থেকেও জুয়াং ও হিন্দুর প্রভেদ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। একটি কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূত্রপাত হলে, জলে ঢিল পড়ার মতো বৃত্তাকারে সেই পরিবর্তনের পরিধি বেড়ে চলে এবং জীবনযাপন ও

সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে তা বিস্তার লাভ করতে থাকে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নূতন ছাঁচে ঢালা হতে লেগেছে, নিজেদের বৈশিষ্ট্যসত্ত্বেও জুয়াংরা স্থানীয় সমাজদেহের অঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

ওড়িশার জুয়াংদের বেলা যেমনটা ঘটেছে অন্য অঞ্চলের উপজাতিদের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটে নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বৈতরণীর তীরবর্তী কৃষকসমাজের সঙ্গে জুয়াংদের যে অন্তরঙ্গ ও দীর্ঘকালব্যাপী যোগাযোগ ঘটেছে, অরুণাচলের উপজাতির সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীদের তেমন যোগাযোগ ঘটে নি, আর ঘটে থাকলেও কালেভদ্রে, পুরুষানুক্রমে নয়। অরুণাচলের আদি কিংবা নাগাল্যাণ্ডের নাগাদের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের সংসর্গ ঘটেছে সম্প্রতি এবং খানিকটা আকস্মিক ভাবে। সেইজন্য দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই রকমের প্রতিক্রিয়া ঘটেছে—এতে আর বিচিত্র কী।
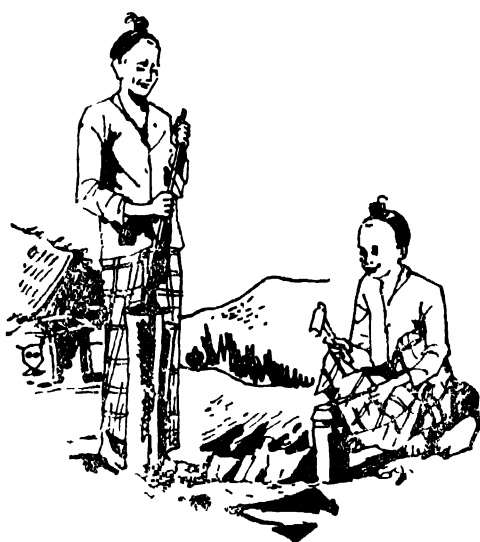
কৃষক, কারিগর ও জাতি

খাদ্যশস্য ও শিল্পসম্ভার উৎপাদনে অনগ্রসর উপজাতি এবং উৎপাদন-কৌশলী সমতলবর্তী কৃষক ও কারিগর— এই উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বহু শত বর্ষ ধরে ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে আসছে। জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস— বিশেষ করে খাদ্যবস্তু যখন প্রয়োজনের নিরিখে অপ্রতুল হল, সংশ্লিষ্ট উপজাতি (যথা ওড়িশার জুয়াং) লক্ষ্য করল পোড়ু চাষের তুলনায় হাল-বলদের সাহায্যে চাষ করা উৎপাদনের দিক থেকে অনেক বেশি লাভজনক। পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি বৃষ্টিপাতের তারতম্য-অনুসারে প্রতি বর্গমাইলে ক্ষেত্রান্তরী চাষ কখনো কম কখনো বা বেশি লোকের খোরাক জোগাতে পারে। কোনো নৃতাত্ত্বিক কিংবা ভূগোলবিদ্ যদি একাধিক একই ধরনের (জমির উর্বরতা, জনসংখ্যা অনুসারে জমির পরিমাণ ও বৃষ্টিপাতের সমতা আছে এমন কোনো) অঞ্চলে

সমীক্ষা চালিয়ে বলতে পারেন কী কারণে উপজাতীয় গোষ্ঠীরা ক্ষেত্রান্তরী পদ্ধতি বর্জন করে কোনো কোনো পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে আল বেঁধে স্থায়ী ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে ও সেখানে হাল-বলদ নিয়ে চাষ দেওয়া শুরু করেছে— তা হলে অনেক নূতন তথ্য জানা যেতে পারে।

অরুণাচল প্রদেশের আপাতানি উপজাতি পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে ধাপে ধাপে অথবা স্তরে স্তরে আল বেঁধে চাষের জমি তৈরি করে এবং নিম্নগামী জলের ধারাকে নানা কৌশলে মুখ ঘুরিয়ে সেচের ব্যবস্থাও করে। কিন্তু নেপালের নেয়ারদের মতো আপাতানিরাও কেবল নিড়ানির সাহায্যে চাষ করে, হাল-বলদ ব্যবহার করে না। হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে কিন্তু স্তর-বাঁধা ক্ষেতে হাল-বলদ দিয়ে লাঙলে চাষ করার রেওয়াজ আছে। এই-সব অঞ্চলে কামার-কারিগর বলে বিশেষ কোনো জাত কোথাও দেখা যায়, কোথাও আবার দেখা যায় না। চাষের জমি কাজে লাগানোর কায়দা কৌশল, কৃষির আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার মতো জাত-কারিগর, উপজাতি অঞ্চলে আছে কি নেই এবং তাদের থাকা না থাকায় প্রতি বর্গমাইলে খোরাকের পরিমাণ বাড়ছে কি কমছে— এই-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে হয়তো স্পষ্ট বোঝা যাবে এক পদ্ধতির উৎপাদন সর্বোচ্চ মানে পৌঁছবার পর কেন অন্য কোনো পদ্ধতির প্রতি নজর যায়।

এই-সব মূল প্রশ্নের জবাব যদিচ আমাদের হাতের কাছে নেই, আমরা চোখের দেখাতেই বুঝতে পারছি ওড়িশার জুয়াং, মধ্য-প্রদেশের গোন্দ অথবা বিহার-বাংলার সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতি, যত দিন যাচ্ছে ততই যেন অধিকতর সংখ্যায় হিন্দু-সমাজের কৃষি-সভ্যতার আওতার মধ্যে এসে পড়েছে। পেশা-হিসাবে লোক-গণনার তালিকাতেও এরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় চাষী, ক্ষেতমজুর কিংবা কতকগুলি পেশার নিম্নতম শাখা-উপশাখায় মজুর বলে পরিগণিত হচ্ছে।

1961 সালের আদমশুমারে দেখা যায় উপজাতিদের খেটে-খাওয়া লোকদের মধ্যে শতকরা 19·59 জনকে বলা হয়েছে মালকচাষী —এমন চাষী যার নিজেরও কিছু চাষের জমি আছে ; শতকরা 10·58 জনকে বলা হয়েছে মজুর-চাষী— যারা অন্যের ক্ষেতে জন খাটে এবং যাদের নিজের কোনো জমি নেই ; শতকরা 11·08 জনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে খনি-মজুর, পাথরকাটা মজুর, বনবিভাগের মজুর, বাগানের মালী, জেলে কিংবা পশুপালক প্রভৃতি শ্রেণীর— শ্রমিক। বিহার, ওড়িশা ও বাংলার সাঁওতাল, বিহারের মুণ্ডা ও ওরাওঁ এবং মধ্যভারতের গোন্দ— এদের মধ্যে থেকে বেশির ভাগ লোক খাদ্যবস্তু ও শিল্পবস্তু উৎপাদনের প্রাচীন প্রথা বা পদ্ধতি ত্যাগ করে ক্রমেই এমন ধরনের কাজকর্মের দিকে ঝুঁকছে যাতে নাকি তাদের সমৃদ্ধতর প্রতিবেশীর সঙ্গে তাদের পার্থক্য দিনে দিনে হ্রাস পেতে থাকে। যে অর্থে আন্দামানের নিষাদ ধীবর ও আহরণকারী উপজাতি স্বয়ম্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে অর্থে এরা আর স্বয়ম্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকতে পারছে না।

অন্যদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসার ফলে কেবল চাষবাসে নয় জীবনের অন্য নানা ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাওঁ ও গোন্দদের কথাবার্তায় আজকাল হিন্দী, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষাতে মিশেল অধিক পরিমাণে দেখা দিতে শুরু হয়েছে। সমৃদ্ধতর প্রতিবেশীদের দেখাদেখি তারা নূতন নূতন জিনিস, নূতন প্রথাপদ্ধতি আয়ত্ত করছে এবং সেইসঙ্গে তাদের নামও। ভাষা ছাড়াও সামাজিক আচার— এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও অল্পবিস্তর প্রভাব যে না এসে পড়েছে—এমন নয়।

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় ওরাওঁদের ধর্ম ও আচার বিষয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। ওরাওঁদের বাসস্থান রাঁচি জেলার পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ ওড়িশা এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের কিছুটা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। অধিকাংশ ওরাওঁ থাকে নিজেদের গ্রামে—নিজেরাই ; তবে কখনো কখনো মুণ্ডা, খারিয়া ও ভূমিজদের

সঙ্গে মিলে মিশে যে থাকে না এমন নয়। ওরাওঁদের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক সংগঠন থাকে, তার নেতৃত্ব করে পুরুষানুক্রমে দলপতি কিংবা পুরোহিতের বংশ। ওরাওঁ কুমারেরা একটা বয়স হলে পর ধুমকুড়িয়া নামে একটি বারোয়ারী আবাসে গিয়ে রাত কাটায়। ধুমকুড়িয়ার পাশেই থাকে নাচ-গানের খোলা মাঠ, সন্ধ্যায় গাঁয়ের মেয়ে ও পুরুষেরা একত্র হয়ে সেখানে নাচে, গায়, খেলাধুলো করে।

যত দিন যাচ্ছে এবং হিন্দু কৃষক সমাজের সঙ্গে ওরাওঁদের সম্পর্ক গভীরতর হচ্ছে, নিজেদের ছেলেমেয়েদের সমবেত নাচের প্রথা বিষয়ে ওরাওঁরা কেমন যেন লজ্জিত ও দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করতে শুরু করেছে। ধুমকুড়িয়া বলে ওরাওঁ যুবকদের যে চমৎকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তা নিয়েও তাদের লজ্জার অন্ত নেই। হিন্দুদের কৃষক সমাজে আচার-বিচার রীতিনীতির বেজায় কদর, তাদের চারিদিকে শতেক বিধিনিষেধের দেওয়াল। ওরাওঁদের সমাজ-জীবনে যে স্বাধীনতা ও সহজ আনন্দ, তার প্রতি এরা কটাক্ষ করবে— এ তো জানা কথা। উপরন্তু হিন্দুরা সমৃদ্ধ ও তাদের তুলনায় ওরাওঁরা গরিব। দেখা গেছে গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে হিন্দু অথবা খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকেরা ওরাওঁদের ধর্ম ও সমাজ— জীবনে একাধিকবার সংস্কার আন্দোলন চালিয়েছেন।* এই আন্দোলনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল টানা ভগত আন্দোলন। এর প্রভাবে রাঁচি জেলার পশ্চিম অংশের অধিবাসী ওরাওঁরা মদ ও মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়। মুখে মুখে এদের মধ্যে কথা রটে যায় যে যেখানে যত জমি আছে সবই ভগবানের এবং মানুষ যদি ভগবানের প্রতি নির্ভরশীল হয় তা হলে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য তিনি তাঁর সন্তানদের মুখে তুলে দেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চাষবাস করা ছেড়ে

---

* এই-সব আন্দোলন-বিষয়ক তথ্যের সংক্ষিপ্তসার দেখা যাবে 1949 সালে প্রকাশিত নির্মলকুমার বসু রচিত 'হিন্দু সমাজের গড়ন' বইটিতে। প্রাপ্তিস্থান: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। 2, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. 31-51

দিল, গোরু-মোষের দড়ি খুলে দিয়ে গোয়াল খালি করে দিল এবং সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ হয়ে অরণ্যের গভীরে বসবাস-ব্রত অবলম্বন করল। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মভাবের এই আতিশয্যের ফলাফল যে সন্তোষজনক হয় নি— সে কথা বলাই বাহুল্য। আন্দোলনের ভালো দিকটা এই যে এর ফলে ওরাওঁরা বেশ সচেতন ভাবে নিজেদের ধর্ম ও সমাজের কিছু কিছু কুসংস্কার দূর করতে পেরেছিল। 1921 সালের অ-সহযোগ আন্দোলন চলার সময় টানা ভগত সম্প্রদায় রাজনীতির সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিল।

শিবভক্ত এবং কবীরপন্থারাও একটা সময়ে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূলে ওরাওঁদের মধ্যে ধর্মভাবের জোয়ার আনতে চেয়েছিল। এইরকম নানাবিধ টানাপোড়েনের ফলে ওরাওঁদের কিছু অংশ নিজেদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে হিন্দুধর্মের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। জাতপাতের সংকীর্ণ রাস্তায় চলতে হলে তারা পথ পেত না, কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তারা প্রবেশাধিকার পেল ভক্তি-আন্দোলনের সিংহদ্বার দিয়ে। মধ্যযুগীয় সন্তদের ধর্ম জাতপাতের বালাই না মেনে নির্বিচারে সকলকে কোলে স্থান দিতে চেয়েছিল— ওরাওঁরা স্থান পেল সেই সুবাদে।

বুন্দু অঞ্চলের মুণ্ডা ও রাঁচির তামারদের মধ্যেও অনুরূপ ধর্মোন্মাদনার সূত্রপাত হয়েছিল। এরা প্রভাবিত হয়েছিল প্রতিবেশী মানভূম জেলার বৈষ্ণব মঠ বা আখড়া থেকে। বুন্দুর মুণ্ডারা বলে কেবল ধর্মাচরণে নয় আহারাদির ব্যাপারেও তারা মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল রাঁচির 'অপবিত্র' মুণ্ডাদের চেয়ে পৃথক। এ-থেকে অনুমান করা যাবে ভক্তিবাদের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে শুচিবায়ু উপজাতি সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। বৈষ্ণব মুণ্ডারা মাংস ছেড়ে দেবার ফলে কীরকম হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তার একটু নমুনা দিচ্ছি। আহার্যে মাংস যদি না থাকে তা হলে তেল কিংবা স্নেহ জাতীয় পদার্থ তো দরকার। যে-সব মুণ্ডা গ্রামে তেলী নেই সেখানে তারা হাতের জোরে ঘানি ঘোরায়। হাল-বলদে তারা

চাষ করে, সুতরাং বলদ দিয়ে ঘানি ঘোরানো তাদের পক্ষে সমস্যাই হয়। কিন্তু পাছে বলদে ঘানি টানলে গাঁয়ের লোক তাদের 'বোষ্টম' না ব'লে তেলী বলে— সেই কারণে হাতের জোরেই ঘানি ঘোরাতে হয়। গ্রাম সমাজে জাতের মর্যাদায় চাষীর চেয়ে তেলী নীচে, সুতরাং বলদ দিয়ে ঘানি টানালে বৈষ্ণব মুণ্ডা চাষীদের যে জাত যায়!

এইভাবে ভারতের অনেক উপজাতিব ভগ্নাংশ থেকে জাতির উদ্‌ভব হয়েছে। ইতিহাসে বার বার এরকম ঘটেছে সেটা অনায়াসে অনুমান করা চলে। মহাভারতে দেখা যায় অনেক অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নাম ভাঁড়িয়ে বর্ণ-হিন্দুসমাজে অনুপ্রবেশ করে থাকবে— এদের মধ্যে ছিল অন্ধ্র, মদ্র, শবর, যবন, কিরাত, পৌণ্ড্র ও আরো অনেক সম্প্রদায়। মহাভারতেই বলা হয়েছে ধর্মীয় ও নৈতিক জাবনে বিশুদ্ধ রীতিনীতিতে এরা যাতে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে সেজন্য এদের যথোচিত সহবত দেওয়া দরকার।

ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল উপজাতিই কিন্তু সমাজ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এদের মধ্যেই অভিজাত যারা, তারা হয়তো প্রায়শ্চিত্ত করে ও অগ্নিশুদ্ধ হয়ে ক্ষত্রিয়পদবাচ্য হতে পেরেছেন। তার আগে অবশ্য কোনো দুঃস্থ বিপ্র (নূতন নূতন যজমান ধরাটাই যার পেশা) পুরাণোক্ত গোত্রপ্রবরের সূত্র ধরে ক্ষত্রাভিমানীর উদ্দেশ্যপূরণে অতি দীর্ঘ একটি কুলজী রচনা করে থাকবেন। কোনো কোনো পুরাণে প্রাচীন পারশ্যের অগ্নি-উপাসক পুরোহিত মেগাস (মেজাই)-এর উল্লেখ দেখা যায়, বলা হয়েছে শকেদের দেশ থেকে এঁরা ভারতে এসেছেন এবং সে-দেশে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের নাম মজা, যত্র বিপ্রাঃ মজাখ্যাঃ।

এইভাবে কোনো কোনো উপজাতি পরিবার বা বংশ উচ্চ বর্ণের মধ্যে সামিল হয়ে থাকলেও তাদের বেশির ভাগ স্থান পায় নিম্ন বর্ণে শূদ্রদের মধ্যে। এদের সকলেই কৃষক কিংবা চাষী মজুর যে ছিল এমন নয়— কেউ কেউ বাঁশ বেত দিয়ে ধামা কুলো প্রভৃতি

বানাত, কেউ-বা লোহা পিটিয়ে দা, কুড়ুল প্রভৃতি তৈরি করত। ছোটোনাগপুরে লোহার কিংবা অসুর নামে যে-দুই কামার জাতি আছে তারা গোড়ায় নিশ্চয় উপজাতি ছিল— এখনো তফসিলে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে বলে দেখা যায়। ওড়িশার পশ্চিমাঞ্চলে পেন্তিয়া ভোই বলে যে লোহার সম্প্রদায় আছে, অন্য হিন্দু কর্মকারদের সঙ্গে তাদের বিস্তর তফাত। তারা পায়ের আঙুল দিয়ে জোড়া হাপর চালায় এবং হাপরগুলি গোরুর চামড়ায় তৈরি। হিন্দু কর্মকারেরা হাপর চালায় হাত দিয়ে এবং সে-হাপর তৈরি হয় ছাগল কিংবা হরিণের চামড়া দিয়ে— গোরুর চামড়ায় নয়। ওড়িশার পশ্চিম এবং উত্তর অঞ্চলে যে-সব তাঁতি ও কলু আছে, তাদের মধ্যে থেকে কোনো কোনো পরিবার নিজেদের মধ্যেই বিয়ে-থা করে, বাড়িতে হাঁস মুরগী পালন করে, কোনো কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে মদেরও চলন আছে। হিন্দু সমাজের 'শুদ্ধ' তাঁতি ও কলুরা এদের 'অশুদ্ধ' বলে থাকে। এদের যন্ত্রপাতি কিংবা পদ্ধতিও স্বতন্ত্র ধরনের। সুতোর টানা পোড়েন কিংবা নকশাও আলাদা রকম।

আমাদের বক্তব্য এই যে, স্থানীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে কোনো উপজাতি পরিবার বা গোষ্ঠী যখন কারিগরিবৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করে, তখন তাদের চেষ্টা হয় যাতে সেই বৃত্তি বা পেশায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে এবং যাতে তা পুরুষানুক্রমে তাদের একচেটিয়া বৃত্তি বা পেশায় পরিণত হয়। রোজগার হ্রাস পেলে কিংবা বেকার হলে এই-সব কারিগর স্থায়ীভাবে কিংবা অস্থায়ীভাবে কৃষিকাজে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কৃষক সমাজেও দেখা যায় যে কিছু কিছু চাষী জাতচাষী বলে স্বীকৃত হয়, যারা ঠেকায় প'ড়ে চাষের কাজ করে তাদের জাতের কথা জিজ্ঞাসা করলে নিজেদের জাতিগত পেশার উল্লেখ করে— কয়েক পুরুষ আগে সে-পেশা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরেও।

এইভাবে উপজাতীয়দের কেউ কেউ কালক্রমে কৃষক কিংবা কোনো বিশেষ ধরনের কারিগর হিসাবে হিন্দুসমাজের বর্ণ-ব্যবস্থায় শূদ্রজাত রূপে স্থান পেয়েছে। মোম গলানো অথবা ঢোকরা পদ্ধতিতে যারা পিতলের কুনকে কিংবা পুতুল ঢালাই করে ; আসাম দেশের হীরা কুমোর যারা হাতে করে মাটির বাসন গড়ে (বর্ণহিন্দুরা এই-সব বাসন বাড়িতে ব্যবহার করলেও পুজোর ঘরে তোলে না) ; পশ্চিম ওড়িশার যে-সব তাঁতি বিশেষ ধরনের কাপড় বোনে ; ছোটোনাগপুরের অসুর যারা এখনো পায়ের আঙুল দিয়ে হাপর টেনে ছোটো ছোটো চুল্লীতে লোহা গলায়— এদের সকলেই উপজাতি-শ্রেণীভুক্ত পরিবার অথবা গোষ্ঠী— যারা কালক্রমে হিন্দুসমাজের কারিগর-জাতিতে পরিণত হয়েছে।

হিমালয় পাহাড়ের দুর্গম প্রদেশে কিছু কিছু অঞ্চল আছে যাকে তফসিলী অঞ্চল বলা হয়, সংবিধান অনুসারে তফসিলভুক্ত উপজাতির প্রাপ্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এই-সব অঞ্চলের বাসিন্দারা ভোগ করে থাকে। ইতিপূর্বে হিন্দুসমাজ ও উপজাতি সমাজের মধ্যবর্তী যে-সব কৃষক ও কারিগর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এই-সব বাসিন্দারা কিন্তু তাদের মতো নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় হিমালয়ের কিন্নৌর অঞ্চলের প্রত্যেকটি লোক কোনো-না-কোনো জাতের অন্তর্ভুক্ত। সমতলবর্তী হিন্দুদের মতো তাদের কেউ কৃষক, কেউ রুপোর অলংকার প্রস্তুত করে, কেউ ছুতোর, কেউ-বা চামার অথবা মুচি। কিন্তু সরকারের সংবিধান মতে উপজাতীয়ের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা তারা পুরোদস্তুর পায়। সরকার এই গোষ্ঠীবিষয়ে যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার সপক্ষে অবশ্য একটি কথা বলা যায় : উপজাতিরূপে এদের মধ্যে যে-সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত ছিল, তার অনেকগুলিই এরা অবিকৃতভাবে রক্ষা করছে। বিবাহ ব্যাপারে সেটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, কিন্নৌর-রমণীরা এখনো দ্রৌপদীর মতো বহু ভর্তার ভজনা করতে পারে। ধর্মীয় ব্যাপারে দেখা যায় তারা শিবমন্দিরে পূজা দেয় এবং অন্য কিছু

কিছু হিন্দু দেবদেবীকে মানে। অপর পক্ষে তারা বুদ্ধেরও পূজা দেয় এবং মহাযানীদের মতো বৌদ্ধ দেবদেবীর স্থানেও জমায়েত হয়। অথচ সমাজ-ব্যাপারে উপজাতীয় প্রথা বর্তমান থাকায়, তফসিলে এরা উপজাতিরূপেই স্বীকৃত। এইভাবে হিন্দুদের জাতের মধ্যে উপজাতীয়েরা অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে— নিজস্ব কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও।

বাস্তবপক্ষে, সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে স্বাধীন থেকেও উপজাতীয়েরা হিন্দুসমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের এমন অনায়াসে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে বলেই, হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা বহু শত বৎসর ধরে টিঁকে আছে। মুসলমান কিংবা ইংরেজের অধীন হয়ে প্রায় সহস্র বছর কেটে গেল, কিন্তু কোনো বিদেশী শক্তি ভারতের জাতিপ্রথাকে টলাতে পারে নি। জাতের মধ্যেই কারো সম্মান কিংবা অধিকার বেশি, কারো বা কম ; কারো শক্তি কিংবা ক্ষমতা বেশি, কেউ-বা নির্যাতিত-অবদমিত। অধিকার কিংবা শক্তির তারতম্য ঘটলে মানুষ সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিলতে পারে না, ফলে সমাজ-দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে জাতিভেদ সমাজের অনিষ্ট সাধন করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু জাতিভেদ যে আজো টিঁকে আছে তা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে এই প্রথার মধ্যে নিশ্চয় একটা শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। এই শক্তি আর-কিছু নয়, একই সমাজ-কাঠামোর মধ্যে এমন কয়েকটি পেশাগত জাতি গঠন করা যারা পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি করবে না অথচ যারা আপন আপন জাতিগত পেশায় পুরুষানুক্রমে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে থাকবে। সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ জাতিগত পেশার সাহায্যে যদি শক্ত করে গাঁথা হয়, তা হলে সমাজের উপরিতলে আচার, বিচার, মত ও পথের স্বাধীনতা বজায় রাখলে কোনো হানি হয় না। ভেদাভেদ স্বীকার করে একটা সার্বিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে সমাজ-দেহকে সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখা— এই হল হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার মূল কথা। সর্বস্তরে সমাজ-

শাসনের যে অ-প্রতিরোধী বিধান হিন্দুসমাজে দেখা যায়, এমনটা অন্য সমাজব্যবস্থায় দেখা যায় না।

কেউ কেউ বলতে পারেন এইরকম ঢিলেঢালা আল্‌গাভাবে জোট বাঁধলে ভেদাভেদই বড়ো হয়ে ওঠে, ঐক্যবোধ মাথা তুলতে পারে না। এমন অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলা চলে না। জাতিভেদের ফলে ভারতে স্বাজাত্যবোধ অথবা একজাতি একপ্রাণ একতার বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি এবং তার ফলে রাষ্ট্রিক দিক থেকে ভারত দুর্বল হয়েছে। অর্থনীতির দিক থেকেও ভারতকে স্থায়ী অবনতির মুখে ঠেলে দিয়েছে ও সারা দেশকে দরিদ্র করে রেখেছে। জাতিভেদ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে ও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে গরিবানা ভাগ করে নিতে শিখিয়েছে সত্য, কিন্তু ঐশ্বর্যসম্পদ উৎপাদনে উৎসাহী করতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতের গ্রাম-সমাজে এই পরস্পর-সহযোগী কিংবা সহভাগী হবার প্রথা বা প্রবর্তনা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ কিংবা রাষ্ট্রিক বিপর্যয় সত্ত্বেও গ্রাম-সমাজ এখনো টিঁকে আছে। জাতিভেদের মধ্যে এই পরস্পর-সহযোগের সুবিধা থাকায় গ্রাম-ভারতের অধিবাসী মুসলমান খ্রীস্টানদের মতো অহিন্দু সম্প্রদায়ও জাতিভেদের কোনো কোনো প্রথা বা ভাব আত্মস্থ করতে দ্বিধা বোধ করে নি। ঐতিহাসিক হিসাবে আমরা যদি নৈর্ব্যক্তিক সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে জাতিভেদের এই-সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিচার করে দেখি তা হলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে হিন্দু-সমাজের সবার নীচু স্তরে স্থান পেয়ে থাকলেও উপজাতিরা কেন এই দুরবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নি। যে ব্যবস্থার ফলে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বজায় থাকে অথচ আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে ন্যূনতম নিরাপত্তার নিশ্চিতি পাওয়া যায়— তার বিরুদ্ধতা করার কোনো অর্থ হয় না।

যাযাবর গোষ্ঠী

খাদ্যশস্য উৎপাদন ও জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে হিন্দুদের সমাজ-ব্যবস্থা উন্নততর হওয়ায় তার প্রভাব কী রকম অনিবার্যভাবে উপজাতি সমাজকে প্রভাবিত করেছে ও তাদের গোষ্ঠী-জীবনে নানা পরিবর্তনের সূচনা করেছে, সে-বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে কীভাবে গরিষ্ঠসংখ্যক উপজাতীয় ক্রমে কৃষিজীবী কিংবা চাষীমজুরে পরিণত হয়েছে এবং বাদবাকি স্থানীয় অথবা আঞ্চলিক চাহিদার তাগিদে কারিগর হয়েছে বা অন্য কোনো জীবিকার সন্ধান করে নিয়েছে। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে জীবিকা পরিবর্তনের অপর একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য। দেখা গেছে কোনো কোনো উপজাতি কিংবা তাদের গোষ্ঠীবিশেষ স্থায়ী বসতিতে কায়েম হয়ে বসতে চায় নি অথবা পারে নি, তারা কোনো কারিগরবৃত্তি গ্রহণ করে লোকবসতির উপকণ্ঠে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। এই-সব যাযাবর কিংবা বেদের দল অর্থনৈতিক দিক থেকে নিজেদের

জীবিকার জন্য মূলতঃ হিন্দুসমাজের চাষী অথবা মজুরদের মুখাপেক্ষী। বর্তমান পরিচ্ছেদে এই-সব ভ্রাম্যমাণ উপজাতিদের বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

বিহার ও ওড়িশার বীরহোড়দের দিয়ে প্রসঙ্গ শুরু করা যাক। এরা মূলতঃ থাকে বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চলস্থ মালভূমিতে। কিছু কিছু বীরহোড় প্রতিবেশী ওড়িশা প্রদেশের ময়ূরভঞ্জ ও কেওনঝর অঞ্চলেও বসতি স্থাপন করেছিল। ওড়িশার বীরহোড়দের আর-এক নাম 'মকরখিয়া কুল্‌হা' অর্থাৎ বানরখেগো কোল। ঢাক ঢোল মাদল ছাইবার জন্য বাঁদরের ছাল নাকি উৎকৃষ্ট। বাঁদরের মাংস কিংবা ছালের লোভে এরা এককালে প্রচুর বাঁদর শিকার করত বলে প্রসিদ্ধি আছে। এমনও বলা হত যে 'মকরখিয়া'দের নাকি নরমাংসেও অরুচি ছিল না। কিন্তু এই বিশ্বাসের সত্যকার কোনো ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। মোট কথা আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বীড়হোড়দের বিষয়ে যে-সব রটনা শোনা যেত তার সঙ্গে বর্তমানের বীরহোড়দের সামান্যই মিল।

বীরহোড় কথাটার অর্থ 'বীর' অর্থাৎ জঙ্গলের 'হোড়' 'মানুষ' —অথবা আরণ্যক। আজকাল দেখা যায় ছোটো ছোটো দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে, এরা হিন্দু কিংবা উপজাতীয় চাষীদের গ্রামের কাছা-কাছি জঙ্গলের ধারে কাছে, ছাউনি ফেলে কিছুকাল বসবাস করে। ছাউনি বলতে নিতান্তই আট-দশটি পাতার ছাউনি বৃত্তাকারে বিন্যস্ত। এই-সব পর্ণকুটিবকে বলা হয় কুম্ব, মোচার মতো আকার, তলদেশের বেড় আট-দশ ফুট, উচ্চতা প্রায় সাত ফুট, গাছের ডাল-পালা ও লতাপাতা দিয়ে সযত্নে বানানো। দুটি কুটিরের মাঝখানের জমি পরিষ্কার করে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার নিজেদের উনুন তৈরি করে নেয়। কাছেই বাসনকোসন ঘষামাজার ব্যবস্থা থাকে। কুটিরের প্রবেশ-পথের সামনে বসে পরিবারের পুরুষেরা আঁশ থেকে দড়ি পাকায়।

প্রায় বছর চল্লিশ আগে নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে

বন্যমহিষশৃঙ্গী মাবিষাদের যুথবদ্ধ নৃত্য

নৃত্যে যোগ দিতে প্রস্তুত গারো চিলোক রমণী

মিকিরদের বাসগৃহ

মিজো দিদিমা

কার্পাসতূলা সিঞ্চনরত ত্রিপুরার বিযাং তরুণী

বাঁশ ও বেতে তৈরী ঝাঁপি পিঠে রিয়াং বালিকা

রিয়াং অলংকারের নমুনা

আন্দামানী তরুণী সখির মুখে উল্‌কি পরাচ্ছে

জানা গিয়েছিল যে বছরে তিন বার করে বীরহোড়রা তাদের বাসস্থান বদল করে। গ্রীষ্মকালে ছায়াঘন বনস্পতির তলায় তারা ছাউনি ফেলে; শীতে খোলামেলা রোদে ঝলমল জায়গাই তাদের বেশি পছন্দ; বর্ষায় তারা 'কুম্ব' রচনা করে এমন কোনো উঁচু জায়গায় যেখান থেকে গড়ানে মাটি দিয়ে বৃষ্টির জল দ্রুত নেমে যেতে পারে। সাম্প্রতিক এক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে জনৈক মার্কিন নৃতাত্ত্বিক বলেছেন যে বীরহোড়দের একাধিক গোষ্ঠীকে বছরে ছয় বারের বেশি ঠাঁইনড়া হতে তিনি লক্ষ করেছেন। বীরহোড়দের সকল অথবা অধিকাংশ গোষ্ঠী বিষয়ে এমন কথা হয়তো খাটে না।

ছাউনি তুলতে বীরহোড়দের এমন কিছু বেগ পেতে হয় না। বিহার সিংভূম অঞ্চলে একটা শীতকাল আমরা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। মনে আছে সকালবেলা জঙ্গলের একটি অংশ পেরিয়ে যাবার সময় ধারে কাছে কোনো জনবসতি দেখতে পাই নি। রাত্রে আমাদের নিজেদের ডাকবাংলোয় ফেরার পথে দেখলাম সেই অংশে একটি গ্রামের পত্তন হয়েছে, সকাল থেকে রাত্রের মধ্যে দশ-বারোটা পর্ণকুটির মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেখে গাঁয়ের একদল কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। আমাদের হাঁকডাক শুনে জনাকত বীরহোড় পুরুষ সত্ত ঘুম থেকে উঠে এসে সামনে দাঁড়াল। তাদের মুখে শুনলাম সেইদিনই তারা ওখানে ছাউনি ফেলেছে। বাইরে তখন মাঘমাসের শীত, কিন্তু বীরহোড়দের গায়ে ছিল পাতলা সুতী চাদর। জনৈক বন্ধু ওদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন প্রখর শীতে ওরা কষ্ট পায় কি না, ওদের একজন শিবিরের মাঝখানে জ্বলন্ত কাঠকুটোর আগুনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'সেংগেল ডো আইংগা লিজা' —আগুন আমাদের অঙ্গবাস।

আজকের দিনে বীরহোড়দের জীবিকার প্রধান উপায় হল পশুশিকার এবং ছোটো-খাটো জন্তুজানোয়ার ফাঁদ পেতে ধরা। তাদের উপার্জনের আর-একটি উপায় হল দড়ি তৈরি। বন থেকে এরা 'চোপ' অথবা 'শিয়ালি' লতার (Banhinia Vatlii) ছাল

ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। সেই ছালের আঁশ থেকে যে-দড়ি পাকানো হয়, গ্রামের চাষীদের কাছে তার খুবই কদর, মূল্যবাবদ তারা পয়সা না দিয়ে ধান কিংবা ভুট্টা দেয়। কিন্তু ফাঁদে ধরা খরগোস কি বনমোরগ অথবা বনের ওষধি জড়িবুটি গাছ-গাছড়া— হাতবদল হয় নগদ দামে। সেই টাকায় বীরহোড়রা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় তেলনুন কেনে।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত হাজারিবাগের জঙ্গলে প্রচুর হায়েনা ও চিতা দেখা যেত এবং কখনো কখনো বড়ো বাঘও। কিন্তু নিরন্তর জঙ্গল সাফ ও বন্য প্রাণী শিকারের হিড়িক চলতে থাকার ফলে, হাজারিবাগে মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। শ্বাপদ ও হিংস্র জন্তুর ভয় কমে যাবার দরুন বীরহোড়দের বেশ কিছু গোষ্ঠী আজকাল ছাগল পুষতে শুরু করেছে। জঙ্গলে ছাগল বেশ চরে বেড়াতে পারে, খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে প্রচুর, ফলে গায়ে-গতরে পুষ্ট হয়, বংশও বৃদ্ধি পায় দ্রুত হারে। বাজারে হাটে পাঁঠা-ছাগল বেচে বীরহোড়রা আজকাল বেশ রোজগার করে। পরোক্ষভাবে এই সমৃদ্ধির অন্যতম পরিণতিরূপে দেখা যাচ্ছে বীরহোড়দের ক্ষুদ্র বসতির আয়তন বৃদ্ধি পেতে লেগেছে, গোষ্ঠী পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে এবং স্থান থেকে স্থানান্তর ঘুরে বেড়ানোর নেশাটাও সেই অনুপাতে কমে যাচ্ছে।

বীরহোড়দের ভাষা মুণ্ডারী পরিবারভুক্ত, কিন্তু মুণ্ডারীর চেয়ে সাঁওতালীর সঙ্গেই যেন এ-ভাষার মিল বেশি। বীরহোড় উপনিবেশগুলি আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্বাদির উপনিবেশ। সকলেই পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় উপনিবেশের কারো কারো মানসম্ভ্রম অপরদের তুলনায় বেশি। এই-সব গোষ্ঠীপতিদের নাম-অনুসারে অনেক সময় গোষ্ঠীর নাম হয়। আমরা যে-গোষ্ঠীর নিকট সংস্পর্শে এসেছিলাম তার নাম ছিল রমনের দল। রমন লোকটা বয়সে প্রবীণ; হিন্দু সাধুদের মতো মাথা ভরা জটা, অথচ পরনে তার কামিজ। উপজাতি মহলে এই জটাধারীর খুব খাতির, প্রতিবেশীরা

বলত রমন নাকি একজন জবর গুণিন, জঙ্গলের গাছগাছড়া জড়িবুটির সাহায্যে সে নাকি শক্ত ব্যামো সব বেমালুম সারিয়ে দিতে পারে।

অর্থনৈতিক অর্থাৎ বিষয়কর্মের দিক থেকে হাজারিবাগ ও ওড়িশার বীরহোড়রা স্থানীয় চাষাভুষোদের সঙ্গে ক্রমেই বেশি করে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ছে। বাস্তবপক্ষে তারা বর্তমানে হিন্দুসমাজের এমন একটি জাতিতে পরিণত হতে চলেছে যারা আরণ্যক হলেও গ্রামসমাজের সন্নিহিত, যারা এমন সব জিনিস বানায় অথবা সংগ্রহ করে—যা নাকি প্রতিবেশী চাষীভাইদের নিত্যপ্রয়োজনের জিনিস।

শরৎচন্দ্র রায় ১৯২৫ সালে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *The Berhors* প্রকাশ করেন। সে-বইয়ে তিনি এই উপজাতিকে 'উঠ্লু' অর্থাৎ যাযাবর 'এবং জাঘী', অর্থাৎ একই জায়গার স্থায়ী অধিবাসীরূপে ভাগ করেছেন। জাঘী যারা তাদের অধিকাংশ লোক আরণ্যক জীবন পরিহার করে চাষবাসে লেগে গিয়েছে। রাঁচি থেকে হাজারিবাগের পথে ওরমাঝির কাছাকাছি একটি গাঁয়ে আমি বীরহোড়দের জাঘী শ্রেণীর কতিপয় পরিবার লক্ষ্য করে দেখেছি। অন্যান্য স্থায়ী চাষী বাসিন্দার সঙ্গে এদের এত বেশি মিল যে বুঝবার জো নেই যে কে জাঘী, কে বা হিন্দু। কিন্তু উঠ্লু হোক কিংবা জাঘী-ই হোক, বীরহোড়রা বিয়ে করে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে— অবশ্য জ্ঞাতিকুটুম্বাদির মধ্যে বিবাহ প্রথা এক হিসাবে জাতিভেদ প্রথারই অন্তর্গত।

ধর্মবিশ্বাসে ও আচার-অনুষ্ঠানে বীরহোড়রা অন্যান্য মুণ্ডারী গোষ্ঠীরই মতন। তবে হাজারীবাগের রমনের দলে একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। অন্য দলের তুলনায় এই দল ছিল সমৃদ্ধ; এরা প্রায়ই শহরের হাটে বাজারে এসে ছোটোখাটো পশুপাখি কিংবা জঙ্গলের জড়িবুটি বেচে বেশ দু-পয়সা কামাত এবং সে-পয়সায় কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি প্রভৃতি কিনত। আগে আগে ধার নেবার দরকার হলে এরা বাজারের মহাজনের শরণাপন্ন হত। লক্ষ্য করে

দেখলাম সেবার রমনের দলেরই একটি স্ত্রীলোক নিজের গোষ্ঠীর লোককে টাকা ধার দিচ্ছে।

রমন-উপনিবেশের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথাও এখানে বলতে হয়। দেখা গেল উপনিবেশের মাঝখানে চারকোনা একখণ্ড জমি পরিষ্কার করে চারদিকে বেড়া বেঁধে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে। একটি বাঁশের মাথায় কতকগুলি পতাকা টাঙিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, জায়গাটা পবিত্র ধর্মমণ্ডপ। রমনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বুঝিয়ে দিল যে জায়গাটা দুর্গামাইজীর থান এবং চারিদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে যাতে মুরগি ঢুকে নিকোনো জমি নোংরা না করতে পারে। এইভাবে হিন্দুদের শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান এবং তাদের দেব-দেবী, বীরহোড়দের ধর্মব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছে এবং এই উপজাতি বলতে শুরু করেছে যে তারা হিন্দুদেরই জাতিবিশেষ।

একটি বিশেষ কোনো উপজাতি গোষ্ঠী হিন্দু সমাজব্যবস্থার সঙ্গে কী ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে— যাযাবর বীরহোড়রা তার অন্যতম উদাহরণ। এরকম আরও একাধিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বীরহোড়রা যেমন সমাজের চাহিদা মেটাবার জন্য একধরনের উৎপাদনে বিশেষ নিপুণতার চর্চা করেছে, ভারতের অন্য অন্য অঞ্চলের উপজাতি গোষ্ঠীরাও তেমনি করেছে আপন আপন ক্ষেত্রে, আপন আপন প্রবণতা অনুসারে। এই প্রকার চাহিদা মেটাবার কতিপয় দৃষ্টান্ত ধরে দিলে বুঝতে সহজ হবে পেশাগত জাতি অথবা জাতিগত পেশার যে প্রথা হিন্দুসমাজের ভিত্তি, সেই প্রথা কী ভাবে উপজাতি সম্প্রদায় বিশেষকে প্রভাবিত করেছে।

ওড়িশার পেন্তিয়া (ভোই) উপজাতির লোকেরা পেশায় কামার। বিহার-পালামৌ অঞ্চলের অসুর ও মধ্যপ্রদেশের আগরিয়াদের তাদের সগোত্র বলে মনে হয়। তাদের কামারশালে দুটি হাপর একযোগে টেনে চুল্লীর আগুন গনগনে রাখা হয়। এরা দুই হাত মুক্ত রাখে হাতুড়ি সাঁড়াশি ধরার জন্য; হাপর টানে পা দিয়ে। জনপ্রসিদ্ধি

এই যে এককালে এরা লোহা-পাথর গলিয়ে লোহা নিষ্কাশন করতে পারত, এদের এই তুই হাপরওলা কামারশালে। আজকের দিনে যদিচ এদের কামার বলা হয়, জাতপাতের নিক্তিতে যারা পায়ে পায়ে হাপর টানে তাদের স্থান হাতে হাপর টানা কুমারদের চাইতে নীচু।

ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে পিতলের কাজ জানে এমন কিছু কামার আছে যারা নিঃসন্দেহে কোনো উপজাতি-বংশোদ্ভূত। বাংলায় এদের বলা হয় ঢোকরা কামার, অন্যত্র এদের ডাকা হয় অন্য নামে। যেখানে যে নামেই এরা থাকুক-না কেন, এক কালে যে এরা যাযাবরের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াত, কোনো একটি জায়গায় স্থিতিশীল হয়ে থাকত না তার অকাট্য প্রমাণ আছে। ঘুরতে ঘুরতে ঢোকরা কামার কোনো গ্রামের উপান্তে এসে ঘর বেঁধে থাকত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করে আনত ভাঙা ফুটো পেতলের বাসন, তারপর মোমে মাটিতে ছাঁচ গড়ে বানাত চালমাপা কুনকে, খেলনা, টাকা জমাবার বাক্স এবং আরো কত কি। গরম ও তরল পেতল ছাঁচে ঢালতেই মোম যেত গলে, বেরোত ঢোকরার কাজ করা এই-সব সামগ্রী। কিন্তু হিন্দুসমাজের কাংস্য-কারদের তুলনায় ঢোকরা কামারদের জাতি কয়েক ধাপ নীচু।

ঢোকরা কামারদের মধ্যেও আবার তুটি ভাগ আছে— তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়েসাদী হয় না। এক দল ছাঁচ বানায় মৌচাকের মোম দিয়ে, অপর দল শাল গাছের রজন দিয়ে। মোম-গলা ঢোকরার কাজ বেশ হাল্কা ও সূক্ষ্ম হতে পারে, তুলনায় রজন-গলা ঢোকরার কাজ একটু ভারী গোছের। উপাদানের এই তারতম্য থেকে ঢোকরা কামারদের যে তুটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ ঘটলেও এক গোষ্ঠী নিজেকে অপর গোষ্ঠীর তুলনায় উঁচু জাতের বলে মনে করে। সহজেই বুঝতে পারি তুটি গোষ্ঠীই উপজাতিভুক্ত, পিতল ঢালাইয়ের কাজে এরা নিজ নিজ পদ্ধতি এখনো আঁকড়ে ধরে আছে— যদিও উভয়েই এখন

উপজাতি-পরিচয় হারিয়ে হিন্দু সমাজে ঢোকরা-কামার নামে পরিচিত।

রাজস্থান, গুজরাত এবং মধ্যপ্রদেশের গাড়িয়া লোহার নামধেয় কামারাও এক কালে হয়তো যাবাবর শ্রেণীর উপজাতীয় কারিগর ছিল। তারা বলে তাদের আদি নিবাস ছিল রাজস্থানের চিতোর রাজ্যে। চিতোর মোগলদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হবার ফলে এখন নাকি তারা দেশছাড়া হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। রথের আকারে প্রকাণ্ড তাদের গোরুর গাড়ি, চাকায় খাটুলির কাঠে নানা-রকম অলংকরণের কাজ, ছইয়ের উপর বিচিত্র সব রঙিন কাপড়ের আচ্ছাদন—এরা দল বেঁধে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে ছাউনি ফেলে। হাতে যতদিন কাজ থাকে, একই জায়গায় থেকে গেল ; কাজ ফুরোলেই ছাউনি গুটিয়ে আবার রথযাত্রা। বলা হয় এরা গোরুর গাড়ি চেপে স্থান থেকে স্থানান্তর যায় বলে এদের নাম হয়েছে গাড়িয়া লোহার। আমার কেমন জানি মনে হয় যে 'গাড়ি' কথাটা 'আগাড়িয়া' কথার অংশবিশেষ হলেও হতে পারে। মধ্য প্রদেশের কামার পেশাধারী আদি উপজাতির নাম 'আগাড়িয়া'। আমার কথাটা অনুমান মাত্র, নিশ্চয় করে এ-সব বিষয়ে কিছু বলা চলে না।

সমাজের চাহিদা মেটাবার অন্যতম উৎপাদন ব্যবস্থা হল পশু-পালন ও পশুচারণ। কাজটা জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য এবং ভালো করে করতে গেলে পুরুষানুক্রমে অর্জিত জ্ঞান বুদ্ধি ও কৌশলের দরকার। এই পশু পালন ও পশু চারণের কাজে যে-সব উপজাতি নিযুক্ত, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গুজরাতের রাবাড়ি, হিমাচল প্রদেশের গদ্দী ও তামিলনাদের টোডা গোষ্ঠী। রাবাড়িরা তফসিল-ভুক্ত উপজাতিরূপে পরিগণিত, এদেরও একপ্রকার যাযাবর বলা যায়। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাবাড়িরাও এক ধরনের মোচার আকার পর্ণ কুটিরে বাস করে— তার নাম 'কুভ'। তাদের গুজরাতী প্রতিবেশীদের বাসস্থানের সঙ্গে এই-সব কুটিরের বিন্দুমাত্র

মিল নেই—মিল যদি কিছু থেকে থাকে তো সে উঠ্‌লি বীরহোড়দের কুম্বর সঙ্গে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এস. এস. সরকারের মতো কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ্ বলেছেন কাথিয়াওয়াড়ের রাবাড়িদের মুখাকৃতি ও দৈহিক লক্ষণ বেলুচিস্তানের ব্রাহুই ও অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মেলে। এরকম সৌসাদৃশ্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এর চেয়েও কৌতূহলের বিষয় এই যে এই পশু-পালক উপজাতি গোষ্ঠী বর্তমানকালে অর্থনীতির দিক থেকে স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত— যেন তারাও হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গ-বিশেষ।

তামিলনাদের টোডারা মহিষ পালন করে। তারা এখনো পর্যন্ত যে ভাবে তাদের উপজাতীয় বিশেষত্বগুলি বজায় রেখেছে, তা সত্যই দেখবার মতো। তারা থাকে উটকামণ্ডের কাছে নীলগিরি অঞ্চলে। তাদের আবাসগৃহ অর্ধবৃত্তাকার সুড়ঙ্গের মতো। তাদের সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে আছে মহিষ। মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো টোডা রমণীরা এখনো বহুভর্তৃকা হতে পারে— যদিচ যুগধর্মের ফলে এই সামাজিক প্রথাতে আজকাল কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছে। এই-সব অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও টোডারা আজকাল বাঁধা পড়েছে প্রতিবেশী হিন্দুদের অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামোর সঙ্গে। হিন্দুদের অনেকেই হয়তো ভাবে যে টোডারা তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অদ্ভুতভাবে বজায় রাখলে কি হয়, তারা আসলে হিন্দু ও জাতিতে পশুপালক।

গুজরাত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের বাঞ্জারা অথবা লাম্বাদিদের প্রসঙ্গও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। বলা হয় অতীত কালে ভারবাহী পশুর পিঠে চাপিয়ে এরা বণিকদের পণ্য বহন করে নিয়ে যেত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। অতীতে তারা যেমন বর্ণাঢ্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরত, আজও সেরকম পরে থাকে। তাদের অলংকারাদি এখনো অধিকাংশই হাতির দাঁতে তৈরি। আজো তারা স্থান হতে স্থানান্তরে যেতে ভালোবাসে। মনে হয়— ভারতে

ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার পর যানবাহন চলাচলের উন্নতির ফলে, বাঞ্জারাদের পরিবহনের পেশা খুব একটা মার খায়। মনে হয় তার পর থেকে তারা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে থাকে। অতঃপর তাদের ক্রিমিনাল অর্থাৎ অপরাধ-প্রবণ উপাজতি বলে সরকার ঘোষণা করেন, ফলে তারা নিকটবর্তী থানায় নিয়মিত হাজিরা না দিলে পুলিশ তাদের উপর হ্যাঙ্গাম হুজ্জত করতে কসুর করত না। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর এই-সব কড়াক্কড়ি উঠিয়ে দেওয়া হয়; বলা হয় বাঞ্জারা, সানসি, লোধা প্রভৃতি উপজাতি-গোষ্ঠী-সম্ভূত লোকেরা স্বাধানভাবে নিজেদের দেশে চলাফেরা কাজকর্ম করতে পারবে। ভূতপূর্ব সরকারের নোটিশ বাতিল হবার ফলে এদের বলা হয় 'ডি-নোটিফাইড'!

উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে যখনই অন্যজাতির লোকেরা ঘর সংসার পেতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে, উপজাতীয়েরা প্রতিবেশীদের জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের নানাভাবে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা এমন সব উপজাতীয়ের কথা বললাম যারা এককালে যাযাবর ছিল— যাদের কেউ কেউ জঙ্গলের পশুপাখি, ফলমূল, জড়িবুটি আহরণ করে সেই-সবের বিনিময়ে জীবিকার উপায় করত; কেউবা করত শশুপালন; কেউ কারিগরী বৃত্তি, কেউ-বা আবার করত ভূমিহীন চাষা হয়ে দিনমজুরী। এইভাবে দেখা যায় স্থায়ী বসতি যেখানেই পত্তন হয়েছে, সেই-সব গ্রাম বা শহরের উপান্তে এসে জুটেছে যাযাবার উপজাতির দল— কাজের আশায় কিংবা জীবিকার আকর্ষণে। এই-সব উপজাতির অধিকাংশই নিজেদের সত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছে বিবাহ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক উৎসবাদির মধ্যে দিয়ে— এমন-কি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আভরণ, অলংকার ও ভাষাতেও স্বকীয়তা বর্জন না ক'রে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে একপ্রকার অনিবার্যভাবেই এদের কেউ কেউ হিন্দুদের জাতি-ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়ে পড়েছে।

ঐতিহাসিক সমীক্ষা

উপজাতিদের জীবনধারণের ধরন এবং প্রতিবেশী অন্য জাতিদের সঙ্গে উপজাতিদের সম্পর্ক, কীভাবে নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে —তারই একটা মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে পূর্ববর্তী দুটি পরিচ্ছেদে। পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন আর্থিক দিক থেকে উন্নত ও সমৃদ্ধতর প্রতিবেশীদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী যোগাযোগের ফলে ছোটো ছোটো ও বিশ্লিষ্ট উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে এই-সব পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটেছে। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অন্য জাতির যেসব লোক জীবিকা অর্জনের তাগিদে বসতি স্থাপন করেছে, তাদেরও প্রতিবেশীসুলভ মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছে উপজাতিদের সঙ্গে। কখনো তারা জঙ্গল সাফ করে চাষের জমি তৈরি করে শান্তিপূর্ণভাবে খেতখামার নিয়ে বসেছে; কখনো বসেছে কারিগর হয়ে— কামার, কুমোর, তেলী, ছুতোর প্রভৃতির কাজ নিয়ে; কখনো বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ঝি-চাকরের কাজ নিয়ে থেকেছে উপজাতি পাড়ায়।

অপর পক্ষে ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে উপজাতীয়েরাও চাষ আবাদের নূতন কায়দার সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের নূতন নূতন ধরনও ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে লাগল। কালক্রমে তাদের কেউ কেউ হিন্দু সমাজের জাতিবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হল— কেউ হল রাজা, কেউ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদকরূপে গণ্য হল, কেউ হল চাকর নফর বা গতর খাটনো মজুর। প্রতি হিন্দু জাতির মধ্যে স্তর-ভেদ থাকে; উপজাতীয়েরা যখন হিন্দু সমাজে স্বীকৃত হল সচরাচর তাদের জন্য পঙ্‌ক্তি নির্দিষ্ট হল সর্বনিম্ন স্তরে। জাতিভেদ প্রথার ফলে ও বংশানুক্রমে জাতিগত পেশা চর্চা করতে গিয়ে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভার উৎপাদনে হিন্দুরা অধিকতর সুদক্ষ ছিল। শস্ত্রের শক্তিতে উপজাতিদের জয় যেখানে করা সম্ভবপর হয় নি, তেমন ক্ষেত্রেও যখনি সম্ভব হয়েছে শাস্ত্রীয় যুক্তিতে বিধান দেওয়া হয়েছে যে উপজাতিকে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করতে হবে খিড়কি দরজা দিয়ে, তাদের ঠাঁই হবে সবার নীচে সবার পিছে। সে যাই হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের এইটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে জাতি ও উপজাতির মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্র ছিল আঞ্চলিক ও সীমিত— যদিও সেই যোগাযোগের কালানুক্রম ছিল যুগ যুগ ধরে ও বহু প্রজন্মব্যাপী।

পেশাগত জাতিভেদ প্রথা যতদিন গ্রামীণ অর্থনীতি ও উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে একাঙ্গী ছিল, জাতি-উপজাতির মধ্যে এই উচ্চনীচ ভেদাভেদও বজায় ছিল। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের ফলে এই অবস্থার মধ্যে বৈলক্ষণ্য দেখা দিল। ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে চাষীরা খাদ্যশস্যের চাষ কমিয়ে দিয়ে ক্রমে কার্পাস, আখ. চা, পাট প্রভৃতি নগদী ফসলের চাষে মন দিতে লাগল। ইংলণ্ড থেকে কারখানাজাত দ্রব্যসামগ্রীর প্রচুর আমদানীর ফলে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

ব্রিটিশের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল যখন মোগল সাম্রাজ্যের মহিমা প্রায় অস্তমিত। দেশময় অরাজকতার ফলে তখন এক অঞ্চলের সঙ্গে

অন্য অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘোরতর মন্দা, জলপথে স্থলপথে তখন ঠগী ডাকাতদের অবাধ লুটতরাজ চলেছে। কৃষি ও শিল্প-কর্মের উপর যাদের জীবিকা নির্ভর করত, সে-সময় তাদের নিদারুণ দুরবস্থা। এককালে তারা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের চাহিদা অনুসারে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার (শিল্পজাত সম্ভারের মধ্যে অনেক মূল্যবান সৌখিন সামগ্রীও থাকত) সরবরাহ করে, অন্যান্য অঞ্চল থেকে, এমন-কি, বিদেশ থেকেও প্রচুর ধনসম্পদ উপার্জন করত। হঠাৎ সমস্ত পথ যেন নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল।

ইংরেজরা এ-দেশে এসেছিল বণিকের মানদণ্ড নিয়ে, এখন রাজদণ্ড হাতে নিয়ে তারা রাজ্যেশ্বর হয়ে বসল। শক্ত হাতে তারা দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনল, দেশময় একই ধরনের শিক্ষা ও শাসন-ব্যবস্থা বিস্তার করল। মোগল সাম্রাজ্যের মরণদশায় দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে-অবস্থা ঘুচে যাওয়ায় শহরে গ্রামে দেশের সকল শ্রেণীর লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। আবার চাষী ধরল হাল, মাঝি নিল বৈঠা, কামার হাতে নিল হাতুড়ি। ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শাসন-সংক্রান্ত কাজে যোগ দিয়ে বড়ো বড়ো শহরের একদল বণিক ও আমলাতন্ত্রী ফুলে ফেঁপে উঠল। কিন্তু এ-সব ব্যাপার আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিক নয় বলে ভারতের অর্থ-নৈতিক ইতিহাস নিয়ে আর বেশি কিছু বলা চলবে না। ব্রিটিশ প্রভুত্বের ফলে উপজাতি-জীবন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এইটাই বর্তমান পরিচ্ছেদের মুখ্য আলোচনার বিষয়। নূতন শাসনের ফলে তাদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ নূতন মোড় নিয়েছে— এমন কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

সরকারী শাসনব্যবস্থা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হল, দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াতের পথ সুগম হল—ফলে জনবহুল সমতট থেকে কিছু কিছু লোক অনুপ্রবেশ করতে লাগল প্রতিবেশী অরণ্যে পর্বতে। তাদের মধ্যে অনেকে উপজাতিদের আবাসভূমিতে কায়েম হয়ে তাদের মধ্যে বসবাস করতে লাগল। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের তুলনায় খুব যে

বেশি লোক উপজাতি-অঞ্চলে সামিল হল— এ রকম বলাটা ঠিক হবে না। তবে আগেকার তুলনায় দুই দলের মধ্যে যোগাযোগের রকমটা পালটে গেল অনেকখানি।

চাষের জমির সন্ধানে কেবল চাষীরা যে অরণ্যে পর্বতে প্রবেশ করল এমন নয়, তাদের কিছু কিছু ছোটোখাটো ব্যাপারী ও সুদখোর মহাজনদেরও সমাগম হল এমন সব অঞ্চলে যেখানে আগে তারা পা দিতে সাহসই করত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একবার দেখা যাক মুণ্ডা ও ওরাওঁ উপজাতিদের আদি বাসভূমি বিহারের রাঁচি জেলায় অবস্থাটা কেমন দাঁড়াল। দেশে শান্তি ফিরে আসার পর হাজারিবাগ, গয়া ও মানভূম জেলা থেকে বহু চাষী চাষের জমির সন্ধানে রাঁচি জেলায় হাজির হল এবং সেখানকার পাহাড়তলীতে কুটির বেঁধে চাষবাস শুরু করে দিল। গোড়ায় মনে হয়েছিল বাড়তি জমি যা পতিত হয়ে আছে তাতে সবাইকার কুলিয়ে যাবে। এই-সব জমির আদি মালিক ছিলেন হিন্দু রাজারা— তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন উপজাতিসম্ভূত। তারা শস্য কিংবা শ্রমের বিনিময়ে খাস জমি প্রজাবিলি করতেন। ব্রিটিশের প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের উপর চাপ পড়ল সরকারের খাজাঞ্চিখানায় নিয়মিত কর জমা দেবার জন্য। সামন্ত রাজারা বিপদে পড়লেন কারণ কর জমা দিতে হবে নগদে এবং একটু একটু করে সরকার করের অঙ্ক বাড়িয়ে দিতে লাগলেন। তখন নিরুপায় হয়ে তাঁরা প্রজাদের উপর চাপ দিলেন যে কেবল শস্য দিলে কিংবা জন খাটলে চলবে না, নগদ খাজনাও দিতে হবে। ব্যাপারী সুবিধা বুঝে মহাজন হয়ে বসল, চড়া হারে সুদ বসিয়ে টাকা ধার দিতে লাগল। গরিব চাষী এবং সরলস্বভাব উপজাতীয়েরা চক্রবৃদ্ধি সুদের হিসাবকেতাব ভালো বুঝতে পারে না বলে মহাজন রক্তচোষা জোঁকের মতো দু'দিনেই ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল।

একই সঙ্গে আর-একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটল। পূর্বেই বলেছি ছোটোনাগপুরের উপজাতি অঞ্চলে হিন্দুসমাজের চাকরনফর শ্রেণীর লোকেরা বসতি স্থাপন করেছিল। তারা বিষয়কর্মের দিক থেকেও

মুণ্ডা-সমাজে নির্বিবাদে প্রবেশ করে তাদেরই একজন হয়ে পড়েছিল —পার্থক্য কিছু ছিল না। অতঃপর যারা এসে বসতি স্থাপন করতে লাগল তারা কিন্তু মুণ্ডা-সমাজের সঙ্গে ঠিক মিশ খেল না।

মুণ্ডাদের মধ্যে জমির দখলীস্বত্ব সচরাচর স্থির হয় খুন্তকাত্তি প্রথা অনুসারে। এই প্রথায় জমির দখলিকার স্থির হয় বংশানুক্রমে, কিন্তু জমির মালিক ইচ্ছা করলে অন্যদের ইজারা দিতে পারে। ব্রিটিশ জমানায় যে-সব ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজন আমদানী হল, তারা কিস্তি খেলাপ কিংবা অন্য নানা অজুহাতে মুণ্ডাদের কাছ থেকে এই ভাবে চাষবাসের জন্য জমি ইজারা দিতে লাগল। পাহাড়ে জঙ্গলে জমির অভাব নেই, সুতরাং মুণ্ডারাও প্রথম প্রথম কোনো আপত্তি তোলে নি।

পরে ব্রিটিশ সরকার যখন কর নির্ধারণ করার জন্য ছোটোনাগপুরে জমি জরিপ করতে শুরু করেন, তখন এই-সব বহিরাগত সুযোগ বুঝে ইজারার জমিতে দখলী স্বত্ব দাবি করে জমি নিজেদের নামে সরকারের খাতায় রেজেস্ট্রি করে নিতে লাগল। ব্যাপারটা হল একেবারে দিনে দুপুরে ডাকাতি করার মতো। এইভাবে যে-সব জমির উপস্বত্ব উপজাতিরা গ্রামীণ গোষ্ঠী অথবা বংশানুক্রমিক ভাবে ভোগদখল করছিল, সেগুলি তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল— কারণ সরকার তাদের রীতি নীতি, প্রথা রেওয়াজ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল ছিলেন না।

এই ভাবে ব্রিটিশ হর্তাকর্তা বিধাতাদের ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশকারীরা পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যায় উপজাতিদের মধ্যে স্থায়ী ভাবে বসল। কিন্তু সংখ্যায় ইতরবিশেষে ততটা এসে যায় নি যেমনটা ঘটল তাদের অ-প্রতিবেশীসুলভ আচরণে। তারা বুঝিয়ে দিল প্রতিবেশী উপজাতিদের সদ্ভাবের উপর তাদের নির্ভরশীল না হলেও চলবে—কারণ সরকার বাহাদুর তাদের রক্ষণপালনের দায়িত্ব নিয়েছেন নিজেদের হাতে। জমির হস্তান্তর বৃদ্ধি যত পেতে লাগল ছোটোনাগপুর রাজ্যের নগদ খাজনার তাগিদও তেমনি বাড়তে লাগল। অবশেষে

দুর্গতি যখন চরমে উঠল উপজাতিরা বাধ্য হয়ে রুখে দাঁড়াল। আগে আগে নীচু জাতের হিন্দুরা উপজাতি-অঞ্চলে এসেছিল স্থায়ী বসবাসের আশায়— তাই প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলে মিশে একাত্ম হতে তাদের দিক থেকে কোনো বাধা ছিল না। এবার যারা অনুপ্রবেশ করল তারা প্রতিবেশী-সম্পর্ক স্থাপনে বিন্দুমাত্র উদ্‌গ্রীব নয়, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল সরকারী আওতায় থেকে যথাসত্ত্বর জমি দখল ও কেনাবেচা করে কিংবা সুদে টাকা খাটিয়ে অর্থ উপার্জন।

জাতিভেদ প্রথার মধ্যে শ্রেণীবিভাগের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখা যায়, এখন তা আর প্রচ্ছন্ন থাকল না, ভেদাভেদ বিদ্বেষের নগ্নরূপ নিয়ে প্রকট হল। শ্রেণীসংঘর্ষের বীজ বপন করা হল উপজাতি অঞ্চলে। নূতন ব্যবস্থায় অনেক অনাবাদী পতিত জমিতে লাঙলের আঁচড় পড়ল, চাষবাসের উন্নতি ও ফসল ফলন বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেল। কিন্তু এখন থেকে প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে মানবিক সৌহার্দ্যের চেয়ে অনেক বেশি জোরদার হল শ্রেণীবিভেদের অর্থনৈতিক কাঠামো। উপজাতি সমাজে জমির মালিকানা ছিল গ্রামের কিংবা গোষ্ঠীর— সমাজ ছিল সমানুভোজী। এখন সে জায়গায় এল জমি থেকে মুনাফা ওঠাবার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা। হিন্দুসমাজের পেশাগত জাতি-ব্যবস্থায় জাতি-উপজাতিতে মেলামেশার ও সহাবস্থান করার একটা সম্ভাবনা ছিল। এখন নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রেণীসংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

ইতিপূর্বেই বলেছি দুর্গতি যখন চরম সীমায় পৌঁছল, উপজাতি গোষ্ঠীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। উনিশ শতক ও তার অব্যবহিত পরবর্তী কালের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের অভ্যুত্থান ঘটেছিল একশো'রও বেশি। মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে সংঘটিত এই-সমস্ত বিদ্রোহ যে কোনো-প্রকার রাজনৈতিক তাৎপর্য অর্জন করতে পারে নি, এটা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। এই-সমস্ত খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আন্দোলনকে একত্র

সংহত করে, বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করার জন্য সারা দেশে একটা রাজনৈতিক বিদ্রোহ গড়ে তুলতে পারত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত শহরবাসী বৃত্তিধারী কিংবা আমলাতন্ত্রী সম্প্রদায়। কিন্তু তারা তখন রাজশক্তির তল্পি বহনেই ব্যস্ত, দেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাদের কোনো আগ্রহ তখন ছিল না। অপরপক্ষে শাসক শক্তি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁরা অনায়াসেই এই-সমস্ত ছোটোখাটো আন্দোলন দমন করলেন। সব-কিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। জেনে শুনে কিংবা না জেনে শুনে সরকার বহিরাগতদের এমন প্রশ্রয় দিলেন যাতে তারা উপজাতি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সরকারের শাসন ব্যবস্থা ও আইনের সুযোগ নিয়ে উপজাতীয়দের শোষণ করতে পারে।

তবে এ-সব ঘটনা যে ইংরেজের অজান্তে ঘটেছিল সে রকম অনুমান করা কঠিন। হাজার হোক তারা তো ঝানু ব্যবসাদার, সুতরাং অন্যায় উপায়ে কেউ যে 'নাফা' তুলছে, এটা নিশ্চয় তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। সুশাসনের খাতিরে সরকার উপজাতিদের আইন-কানুন আচার-বিচার নিয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। শোষক ও প্রবঞ্চকদের কবল থেকে এদের রক্ষা করার প্রশ্ন সেই প্রসঙ্গে এসে পড়ল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দেখা গেছে যে সুশাসনের খাতিরে এবং সর্বশ্রেণীর প্রজাসাধারণের সুখ-সুবিধা বিধানের প্রয়োজনে, শাসকশ্রেণী এইভাবে নৃতত্ত্ব-বিষয়ে জানতে বুঝতে চেয়েছেন। বহু ক্ষেত্রে এইভাব নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। সে যাই হোক, দেখা যায় যে সরকার এক হাতে খুব শক্ত হয়ে উপজাতি আন্দোলন দমন করেছেন আবার অন্য হাতে তাদের দুর্গতি মোচন করার জন্য তাদের রক্ষণপালনের জন্য এবং সর্বোপরি ব্যাপারী ও মহাজনদের কবল থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ব্যাপারী মহাজনরা যে কেবল মুনাফা কামিয়েছে, উপজাতিদের কোনো উপকার করে নি— এরকম ভাবাটাও ঠিক নয়। সমতলের চাষী এসে পাহাড় জঙ্গল কেটে অনাবাদী জমিতে ফসল ফলিয়েছে। তেমনি ব্যাপারী

মহাজনেরা অসময়ে উপজাতিদের ধার দিয়েছে, দাদন দিয়েছে। তবে উপজাতিদের এজন্য দণ্ড দিতে হয়েছে প্রচুর। যে-সব অঞ্চলে মালিকানা বা মুনাফার ব্যাপার কেউ জানে না, সেখানে যখন এ-সব ঢোকে তখন এইরকম বিপর্যয়ই সচরাচর ঘটে থাকে— লোভ এমনই রিপু যাকে সংযত করা সাধু ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাধ্য। উপজাতি ও তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক বিচারের ইতিহাস অনুধাবন করতে গিয়ে একটি কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই— তা হল এই যে ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রত্যক্ষ ফল হল উপজাতি-অঞ্চলে মুনাফা ও মালিকানার অনুপ্রবেশ।

বর্তমান প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, যদিচ উপজাতিদের কল্যাণে ব্রিটিশ সরকার এ-ভাবে উদ্‌যোগী হয়ে মহাজন ও ভূমি-লোভীদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন, অপর একটি ব্যাপারে তাঁদের নিজেদের আচরণই সন্দেহের কারণ বলে অনুভূত হয়েছিল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা আবিষ্কার করেন যে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ এবং দক্ষিণে নীলগিরি অঞ্চল যথাক্রমে চা ও কফি উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট ভূখণ্ড। এ-সব অঞ্চলে কী ভাবে তাঁরা অনুপ্রবেশ করলেন, কুলির কাজ করার জন্য কী ভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করলেন— এ-সমস্ত এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

উপজাতি অঞ্চলে চাষের জমি হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা প্রবল হয়ে উঠল। চা ও কফি কোম্পানিগুলি ঠিক সেই সময়েই দালাল নিযুক্ত করে গিরমিটিয়া কুলি রংরুট করতে শুরু করলেন। নিজ বাসভূমি থেকে উৎপাদিত এই উপজাতীয়দের মধ্যে থেকে এই-সব দালাল সব চাইতে বেশি কুলি সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

কুলিরা বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ থেকে দলে দলে চালান গেল আসাম ও উত্তর ভারতের চা-বাগানে। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা ও খারিয়া উপজাতির লোক। তেমনি ফিজি, দেমেরারা, মরিশাস ও ত্রিনিদাদে যখন কুলির প্রয়োজন হল

বিহারের দুধ খারিয়া উপজাতিব ঢাকী

আন্দামানী রমণীদ্বয়

বিহাবেব খোইযাল নৃত্যপটিযসীব দল
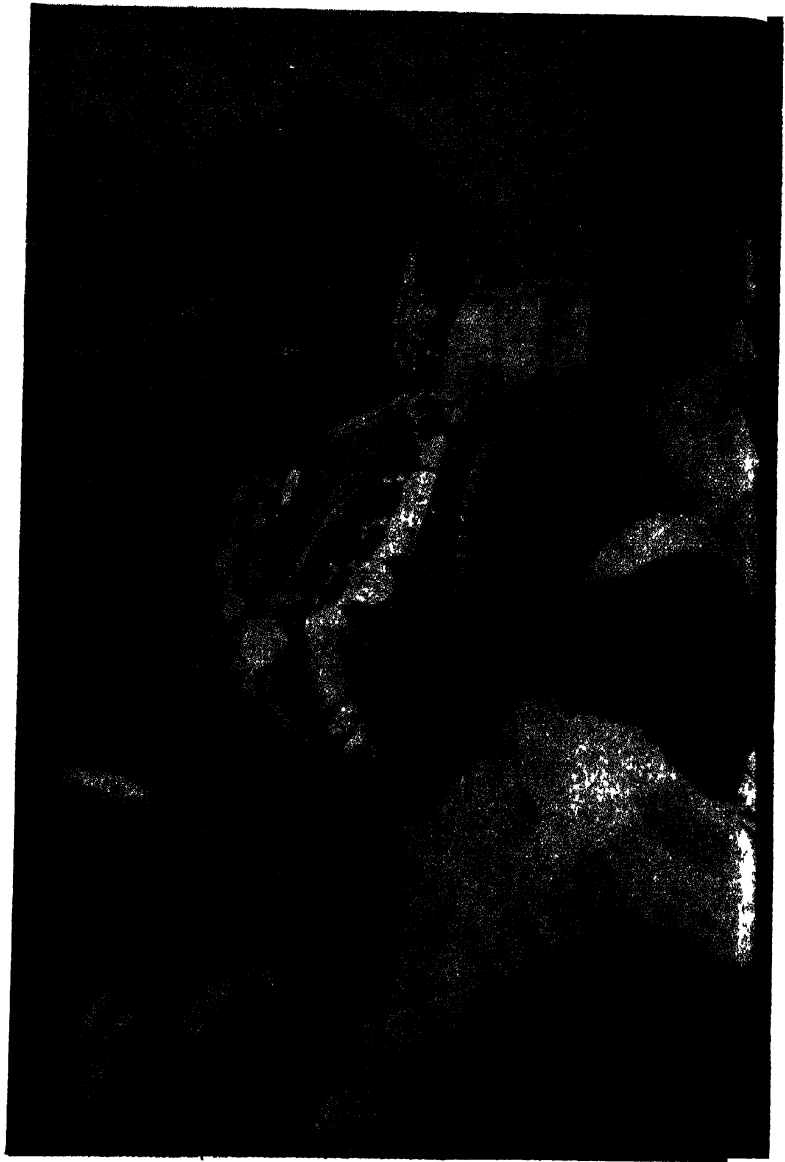
মধ্যপ্রদেশস্থিত আদিবাসী রমণীর ভূষণসম্ভার

আখের চাষ করতে, তখন কুলি চালান গিয়েছিল উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু থেকে। কারণ এ-সব দেশে চাষের জমি যতটা ছিল তার অনুপাতে বুভুক্ষুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এরা উপজাতীয় না হলে কী হয়, মুনাফার লোভে মানুষকে দিয়ে দাসত্ব করার কৌশল উভয় ক্ষেত্রে একই রকম। ব্রিটিশ সরকার নিশ্চয় বুঝেছিলেন চা-বাগানের কুলির জীবন এবং ক্রীতদাসের জীবনে বিশেষ কোনো তফাত ছিল না। যে-সরকার অসাধু ব্যাপারী ও সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, ন্যায়বিচারে ইংরেজদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তৎপর হয়েছিলেন, চা-বাগানের কুলিদের বেলা কিন্তু সে-সরকার বাহাদুর অনুরূপ তৎপরতা দেখাতে পারলেন না। সে-ক্ষেত্রে ব্রিটিশ চা-কোম্পানিগুলির স্বার্থই তাঁরা বড়ো করে দেখেছিলেন এবং কুলিদের কল্যাণে ততখানি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন যতটা নাকি ইংরেজ মালিকের মুনাফা ধরে টান না দেয়। এক কথায় বলা যেতে পারে ব্রিটিশ মূলধন খাটিয়ে ভারতের আর্থিক উন্নতির অজুহাতে নিজেদের দেশে কোম্পানির অংশীদারদের প্রচুর লভ্যাংশ পাইয়ে দেওয়াটাই ছিল যেন সরকারী নীতি। উপজাতি-সমস্যা ও কুলিদের সমস্যা এক করে না দেখে, তাঁরা কুলিদের সমস্যা দেখেছিলেন নেলসনের মতো কানা চোখে দূরবীন লাগিয়ে।*

*1874 সাল শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত শ্রমজীবি' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। শ্রমিকদের সংগঠন করার কাজে তিনিই প্রথম ব্রতী হন। তাঁর কাজে সহায়তা করতেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও আরও কেউ কেউ। তাঁদেরই অন্যতম একজন ব্রাহ্ম প্রচারক ছিলেন রামকুমার বিদ্যারত্ন। ইনি গোপনে আসামের চা-বাগানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং গিরমিটিয়া কুলিদের জীবনযাত্রা বিষয়ে প্রচুর প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করেন। আসাম থেকে ফিরে এসে সেই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি একটি বই লেখেন *Slave Trade in Assam*— দ্রষ্টব্য Bose, Nirmal Kumar: *Modern Bengal*, Calcutta, 1959, পৃ. 67-68.

এ-সব থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্রিটিশ সরকারের মনে ভালো ও মন্দ দুরকম ভাবেরই সংমিশ্রণ ঘটেছিল। শান্তি স্থাপন ও ক্ষমতাশালী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সরকার তাঁদের অজান্তেই উপজাতি ও তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সম্পর্কে একটি গুরুতর পরিবর্তনের সূত্রপাত করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের তাঁবে থেকে এবং তাঁদের ছত্রছায়ার সুযোগ নিয়ে একদল লোক কী ভাবে কেবল মুনাফার লোভে উপজাতি অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল- সে-সব কথা ইতিপূর্বে বলেছি। তারা যে প্রবেশ লাভ করতে পারল—সেও ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণে। এ-কথাও বলেছি ব্রিটিশ আওতায় দু-পক্ষে যে ধরনের যোগাযোগ ঘটল সে ধরনটুকু সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে মুনাফার প্রশ্ন ছিল গৌণ, মুখ্য প্রশ্ন ছিল পরস্পরকে স্বীকার করে পরস্পরের সহযোগ করে একই অঞ্চলে সহাবস্থান করা। সেখানে প্রতিবেশী-নির্ভরতাই ছিল বড়ো কথা, তৃতীয় পক্ষের মুরুব্বীয়ানার কোনো প্রশ্ন ছিল না।

দেশ স্বাধীন হবার পর উপজাতি-জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। তার কারণ প্রধানতঃ দুটি: প্রথমতঃ পরিকল্পিতরূপে দেশে দ্রুত শ্রমশিল্পের বিকাশ এবং দ্বিতীয়তঃ বয়স্কদের ভোটাধিকার বলে উপজাতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উদয়। এই দুটি কারণের সমবায়ে উপজাতিদের সঙ্গে তাদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সাম্প্রতিক কালে এই যোগাযোগ কী রকম রূপ পরিগ্রহ করছে তারই মোটামুটি একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করব এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্ট অংশে।

উত্তর স্বাধীনতা যুগে ভারতের সর্বত্র পথঘাট সম্প্রসারিত হয়েছে ও যানবাহনের চলাচল সুগম হয়েছে। পূর্বে যে-সব গাঁয়ের লোক অবলীলায় বিশ-চল্লিশ মাইল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করত, আজকাল তারা দু-চার মাইল দূরে যেতে হলে বাস্‌-এ চেপে যায়। পরিবহনের সুবিধা এখন সর্বজনের আয়ত্তে। এর ফলে একদিকে শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপর দিকে উপজাতি অধিজাতির

লোকের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ সম্ভবপর হচ্ছে। ইতিপূর্বে এরকম সুযোগ কখনো ছিল না। উপরন্তু প্রতিরক্ষার খাতিরে আজ আমাদের সীমান্তরক্ষী সৈন্যদের কখনো যেতে হচ্ছে উত্তর-পূর্বে অরুণাচলে কখনো বা উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের কিনৌর, লাহোল স্পিটি অঞ্চলে। ভারতীয় সৈন্যেরা ভারতের সর্বত্র আজকাল চলাফেরা করে, পথে-ঘাটে নানারকম যানবাহন দেখা যায়, রাস্তাঘাট তৈরি করার বুলডোজারও কখনো বা নজরে পড়ে। আগে এ-সবের কথা কানেও আসত না— চোখে দেখা তো দূরের কথা।

বছর কয়েক আগে অরুণাচলের কোনো কোনো স্কুলে ও কলেজে কিছু কিছু উপজাতীয় ছাত্রদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল। স্কুল-কলেজ থেকে বেরোবার পর তারা কী ধরনের কাজ করতে চায়— আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। একটি অঞ্চলের বয়স্ক ছাত্রদের অধিকাংশ এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিল যে তারা সৈন্যদলে যোগ দিতে চায়। কিছু ছাত্র সরকারী চাকরিতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মুষ্টিমেয় বলেছিল তারা শিক্ষক কিংবা বিজ্ঞানী হতে চায়। স্পষ্ট বুঝেছিলাম সৈন্যদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রের কদর তাদের কাছে অন্য 'নিরীহ' কাজের তুলনায় অনেক বেশি। তা ছাড়া সৈন্য হলেই তো নানারকম যানবাহন চড়ে দেশবিদেশ ঘুরে দেখা যায়।

বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপজাতি অঞ্চলের পরিস্থিতি কিন্তু সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে পৃথক। এই-সব প্রদেশের খনিজ সম্পদ বিস্তর, প্রপাতে নদীতে বাঁধ বেঁধে জলবিদ্যুৎও উৎপন্ন হয় বিস্তর। ফলে গত দুই দশকের মধ্যে রাঁচি, রাউরকেলা, ভিলাই, বাইলাডিলা প্রভৃতি জায়গায় অনেক খনি খনন করা হয়েছে এবং আশেপাশে কলকারখানা গড়ে উঠেছে প্রচুর। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে আগেও যে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় নি—এমন নয়, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জামসেদপুরের লোহা ও ইস্পাতের কারখানার কথা উল্লেখ করা যায়। তা ছাড়া আছে সিংভূমের তামার খনি, গিরিডি অঞ্চলের

অভ্রের খনি ইত্যাদি। পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের কয়লা খনি থেকে কয়লা তোলার কাজ তো চলেছে একশো বছরেরও বেশি কাল ধরে। সেকালের খনি কিংবা কয়লার কুলি মজদুরের কাজ বিশেষ করে এমন কাজ যেখানে করণ-কৌশলের দরকার কম— বেশির ভাগ ক্ষেত্রে করত স্থানীয় উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। তাদের অনেক খনিতে বা কলে কাজ করে ও আপন গাঁয়ে হাল লাঙল ধরতে পারত। খেত খামারের সঙ্গে কলকারখানার তেমন উগ্র কোনো বিরোধ ছিল না। কলকারখানার সংখ্যা কম থাকায় মজুরের সংখ্যাও আজকের তুলনায় ছিল ঢের কম।

আজকের অবস্থা স্বতন্ত্র। আজকাল ঢিমে তেতালায় কাজ করলে চলে না। কলকারখানা পত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে যেখান থেকে হোক-না কেন দলে দলে মজদুর সংগ্রহ করতে হয়। বৃহদায়তন শ্রমশিল্প চালনা করতে হলে কেবল স্থানীয় লোকের মুখাপেক্ষী হলে চলে না। আজকাল তাই দেখা যায় ওড়িশা কিংবা মধ্যপ্রদেশের কলকারখানায় কাজ করছে উত্তর প্রদেশের লোক ছাড়াও পঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর লোক। বিরাট শ্রমিক বাহিনী গড়ে তুলতে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে।

স্থানীয় লোক স্থানীয় কলকারখানায় সকল সময় প্রচুর সংখ্যায় কাজ পায় না— এ রকম অভিযোগ ছাড়াও মুখ্যত কৃষিজীবী উপজাতীয়দের আর-একটি গুরুতর অভিযোগের কথা প্রায়ই শোনা যায়। কলকারখানা পত্তন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ভিটেমাটি খেতখামার থেকে উৎসাদিত হয়ে পড়ে। এই রকম উদ্‌বাস্তুদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থমূল্য কিছু কম দেওয়া হয় না। কিন্তু সব সময় অন্যত্র চাষী হিসাবে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ঠিকমতো করা হয় না অথবা কলকারখানার কাজে যোগ দেবার মতো করে তাদের শিখিয়ে পড়িয়েও নেওয়া হয় না। সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা অনেক সময় ভুলে যান যে তাদের কাছে টাকার চেয়ে কাজ বড়ো এবং কাজ যদি না থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণের টাকাটা প্রতিদিনের

প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে অতি শীঘ্র শেষ হয়ে যায়। এর ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং উদ্‌বাস্তুরা একই এলেকার লোক বলে সহজেই জোট বেঁধে তাদের সেই অসন্তোষকে রাজনৈতিক রূপ দিতে পারে। তা ছাড়া তাদের উসকানি দেবার লোকের অভাব হয় না।

অপর ত্রুটি— যে কারণে উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সঞ্চার হয় সে হল সরকারী বন-বিভাগের সঙ্গে তাদের অসদ্ভাব। দেশের জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আজকের দিনেও দেশের অধিকাংশ লোক জীবিকার নিরাপত্তার সন্ধান করে চাষবাসে। ফলে বন কেটে বসতি স্থাপনের রেওয়াজটা আজও অব্যাহত, জমির ক্ষুধা অপরিমিত হবার দরুন বনজঙ্গল কেটে চাষের ক্ষেত তৈরি হচ্ছে। ফলে বৃষ্টিপাত হ্রাস পাচ্ছে, বৃষ্টি সারা বছর ঘুরে পড়ে না, যখন পড়ে তখন অঝোর ধারায় উপরিতলের উর্বর মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়, ক্ষয়ে গিয়ে পড়ে থাকে মাটির কংকাল— খোয়াই। বন কেটে যে চাষের জমি তৈরি করা হল, তা কয়েক বছরের মধ্যে চাষের অযোগ্য হয়ে যায়। দেশের এই সমুহ ক্ষতি নিবারণ করার জন্য বন-বিভাগ তাই বন-সংরক্ষণের জন্য সর্বদা চেষ্টিত। বন-বিভাগের জমি যাতে বেহাত না হয়ে যায়, চাষীরা যাতে বনে অনুপ্রবেশ না করতে পারে— সে-জন্য তারা সদা সতর্ক। বনের চার দিকে তারা বেড়া দেয় যাতে বনের কাঠকুটোর লোভে লোকে অনধিকার প্রবেশ না করতে পারে, ছাগলে গোরুতে যাতে না ঢুকতে পারে। উপজাতীয়েরা এ-সব বরদাস্ত করতে পারে না, তারা সংরক্ষণের প্রয়োজন বুঝতে পারে না, নিজেদের আশু প্রয়োজন মেটাবার উপরটা তাদের চোখে বড়ো হয়ে উঠে। তারা ভাবে পুরুষানুক্রমে তারা বনে জঙ্গলে থেকে এসেছে, সুতরাং বন-জঙ্গল তাদের একান্ত নিজস্ব। তাই বন-বিভাগের নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে তারা সংরক্ষিত বন-ভূমিতে ঢুকে পড়ে, গোরু ভেড়াকে উসকানি দেয় বেড়া ভাঙতে, ফলে বন-সংরক্ষণের কাজ পদে পদে ব্যাহত হয় এবং বন-বিভাগের লোকদের সঙ্গে উপজাতীয়দের ক্রমাগত খিটিমিটি বাধে।

কিন্তু এই অসন্তোষের কারণটা দূর করা হয়তো তেমন কঠিন নয়। উপজাতিদের নিজেদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এমন খুব কম লোকেই আছে যারা জানে বনের সঙ্গে বৃষ্টিপাত তথা কৃষির কত নিকট সম্বন্ধ। বন-বিভাগের লোকেরাই এ-সব বিষয়ে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে পারে, এমন-কি, তাদের বিভাগীয় কোনো কোনো কাজেব জন্য উপজাতীয়দেরই নিযুক্ত করতে পারে। তা হলে মাস মাহিনায় তারা বন-সংরক্ষণ করতে পারে। এমন-কি, কোনো কোনো বনজ সামগ্রীর ব্যবহারে তাদের অগ্রাধিকারও দেওয়া যেতে পারে। প্রতিবেশী অঞ্চলের চাষবাসের উন্নতি সাধন করে যদি ফলন বৃদ্ধি করা যায়, তা হলে বনের প্রতি লোভটাও হ্রাস পায়। উপরন্তু বনজ সামগ্রী দিয়ে কিছু কিছু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পও গড়ে তোলা যায় সন্নিহিত অঞ্চলে।

দুর্ভাগ্যের কথা উপজাতি-অঞ্চলে ঠিক যেমন মাথাওয়ালা মুরুব্বি লোকের প্রয়োজন তেমন কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। অপর পক্ষে বন বিভাগও রুটিন মাফিক কাজ করে যায়, স্থানীয় জননেতাদের সহায়তা সহযোগিতা পাবার জন্য তাদের আন্তরিক উৎসাহ নেই, উপরন্তু বন-সংরক্ষণের কাজে সব-সময় ঠিক লোক পাওয়া যায় না, সংখ্যায় ও দক্ষতায় তারা কম থাকে। কাজে কাজেই বন-বিভাগের সঙ্গে স্থানীয় উপজাতিদের অনেক সময় জবরদস্তি এবং জুলুম জরিমানার সম্পর্ক। এরকম অবস্থা চলতে দেওয়া অবাঞ্ছিত এবং কেন যে চলবে তারও কোনো মানে নেই। আঞ্চলিক জন-নেতাদের উচিত স্থানীয় উপজাতিদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তোলা এবং বন-বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁদের অঞ্চলস্থিত জমি সুপরিকল্পিতভাবে সদ্‌ব্যবহার করা। আখেরে যাতে জনগণের অর্থাৎ দেশের ও দশের মঙ্গল হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে চলা দরকার। কিসে চাষীর সাময়িক উপকার হবে কিংবা উপজাতির সাময়িক সুবিধা হবে— সেই-সব কথা চিন্তা না করে সকলের স্থায়ী মঙ্গলকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে।

ভারতে গণরাজ্য স্থাপনের পর কী কী কারণে উপজাতীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে— উপরে সে-সব কথা বলা হল। আজকাল তাদের সঙ্গে প্রতিবেশীদের ঘন ঘন যোগাযোগ ঘটে— সে-যোগাযোগের হার যেমন দ্রুত তেমনি ব্যাপক। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার অব্যবাহিত ফল হিসাবে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে একটি ধারণা প্রসার লাভ করছে যে তাদের উপজাতি অঞ্চল তাদেরই বাসভূমি— অন্যেরা সেখানে বহিরাগত আগন্তুক বিশেষ। ভুলেই হোক কিংবা ইচ্ছা করেই হোক, তারা মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখায় যেন উপজাতি হিসাবে তাদের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন— সুতরাং নিজেদের অধিকার কায়েম করার জন্য তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে। ভারতের অপরাপর নাগরিকদের সঙ্গে কোনো একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে তারা যদি মিলে যায় তা হলে তাদের ভয় যে নিজেদের উপজাতি-পরিচয়টুকু তারা খুইয়ে বসবে। সম্প্রতি তাদের পৃথক সত্তা জাহির করার জন্য একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। নিজেদের উপজাতীয়তা প্রচার করবার বেলা তারা একত্র মিলিত হতে পারে— তখন মুণ্ডা আর ওরাওঁদের মধ্যে, নাগাদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে, খ্রীস্টান অখ্রীস্টানের মধ্যে কোনো তফাত থাকে না। তাদের নিজেদের মধ্যে এক ধরনের উপজাতীয় একতা গড়ে তোলার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে— এই আগ্রহে ইন্ধন যোগাচ্ছে ভারত-সংবিধান-সম্মত সকল বয়স্কদের ভোটের অধিকার। ভোটের বেলা ভাষা, জাতি উপজাতি অথবা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে ভারতীয়দের বিভক্ত না করে যদি পেশাগত অথবা আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করা যেত— তা হলে হয়তো এই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হত না।

উপজাতায় একতা আনয়নের এই চেষ্টা থেকেই হয়তো উপজাতীয়েরা ভারতের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির শরিক হবার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। ভ্রমাত্মক হলেও এই পদক্ষেপ এক হিসাবে উপজাতিদের আধুনিক যুগধর্মে উত্তরণ বলা যেতে পারে। এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়েরা যদি প্রাজ্ঞ কিংবা শুভবুদ্ধি প্রযুক্ত

না হন, তা হলে এই পদক্ষেপের ফলে দেশের মূল ধারা থেকে উপজাতিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। দেশের বিশেষ কোনো গোষ্ঠী যখন অপর গোষ্ঠীদের প্রতি দৃক্‌পাত না করে নিজের কোলের দিকেই ঝোল টানতে চায়, অন্যদের সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে চায়, যখন একই কাজে নিযুক্ত হয়েও একজন অন্যদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা বা অধিকার দাবি করে, তেমন অবস্থায় দেশের সার্বিক সংহতি দুর্বল ও বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।

সমাজের গঠন

মানুষ একক জীবন যাপন করে না। মানুষ মানুষের প্রীতি ও সাহচর্য চায়, আহার্য চায়, আশ্রয় চায়, খেলাধুলা বিনোদন চায়। তার এই-সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য মানুষ পরিবার কিংবা গোষ্ঠী গঠন করে, এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে যার মধ্যে দিয়ে তার দেহ ও মনের এই-সব চাহিদা মেটানো সম্ভবপর। ভারতের উপ-জাতীয় লোকেরা কী ভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে—সে-বিষয়ে ইতিপূর্বে বলেছি। সেই প্রসঙ্গে এ কথাও বলেছি কালক্রমে যখন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল জীবন-ধারণের উদার ও উপকরণ তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় নি। ফলে যে-সব প্রতিষ্ঠান মারফত তাদের সামাজিক, আথিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলিরও নিত্য পরিবর্তন কিংবা রূপান্তর ঘটেছে। বাস্তবপক্ষে মানুষের চাহিদা এবং চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থাপনায় কখনো সম্পূর্ণ সমতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ভারতের উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সমাজ ব্যবস্থা আমরা যদি বর্ণনা করতে বসি

তা হলে সে হবে দ্রুত পরিবর্তমান দৃশ্যের স্থির চিত্র আঁকার প্রয়াসের মতো প্রাণহীন ও অবাস্তব। আজ যে-ছবি বাস্তবানুগ, কাল তা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বদলে যেতে পারে। কালচক্রে মানুষের মানস প্রকৃতিতে যেমন মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানাদিতেও তেমনি ঘন ঘন পরিবর্তন হতে বাধ্য। যথাযথ ছবিটুকু তুলে ধরতে হলে বরং বিশেষ কোনো একটা সময়ের মধ্যে মানুষের পরিবর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে তার রচিত প্রতিষ্ঠান কী ভাবে তাল রেখে চলে, তার একটা নমুনা দেবার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু যে-বই আদপে বই নয় বইয়ের ভূমিকা মাত্র, তার ছোটো একটি পরিচ্ছেদের পরিধির মধ্যে সে-ছবি দিতে গেলে পণ্ডশ্রম তো হবেই, উপরন্তু যতটা না আলোকসম্পাত করছে তার চেয়ে ঢের বেশি ছড়াবে বিভ্রান্তির ধোঁয়া। আমরা সে-পণ্ডশ্রমে প্রবৃত্ত হতে চাই না।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি কী ভাবে উৎপাদনে অধিকতর দক্ষ সংখ্যাবহুল প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে এসে উপজাতি গোষ্ঠীদের জীবনযাত্রার ধরনে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে। দুই দল পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে উভয়েরই প্রতিষ্ঠান সমূহের গঠনে ও কার্যপদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে।

আগেই বলেছি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উপজাতি-জীবন কী ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, এই পরিচ্ছেদে তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমরা একটা সহজতর পন্থায়, নিছক নমুনা হিসাবে কয়েকটি উপজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক কাঠামোর কতিপয় দিক নিয়ে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করতে চাই। সম্ভব-ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তনের সম্মুখীন তাদের হতে হয়েছে সে-বিষয়েও দু-চার কথা বলার চেষ্টা করব।

সূচনাতেই বলে রাখা দরকার জনসংখ্যার দিক থেকে সমতলের কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়ের তুলনায় উপজাতিরা সচরাচর অপেক্ষা-কৃত ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে বসবাস করে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা যায় উত্তর-পূর্ব ভারতে সেখানকার নাগা প্রভৃতি যুযুধান

উপজাতি গোষ্ঠী যুদ্ধজয়ের খাতিরে দলে ভারী হয়ে থাকতে চায়। এই-সব গোষ্ঠীর নেতা না থাকলে চলে না। আবার এমনও সব গোষ্ঠী আছে যাদের কোনো বংশানুক্রমিক বা নির্বাচিত নেতা নেই, যারা বয়সে কিংবা জ্ঞানে প্রবীণ অথবা বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়— পারিবারিক কিংবা গোষ্ঠীগত কোনো সমস্যার সমাধানে।

সুতরাং সমতলের প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় সাধারণতঃ উপজাতিরা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে থাকা পছন্দ করে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না এমন নয়। রাজনীতিক অর্থে যাদের নেতা বলা হয় তেমন নির্বাচিত প্রধান তাদের মধ্যে বড়ো একটা দেখা যায় না। তারা সামাজিক, আর্থিক অথবা রাষ্ট্রিক এমন বহু সমস্যার সমাধান অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর আলোচনার সূত্রে করে— যার জন্য সমতলীরা নানা-রকম প্রতিষ্ঠানের দারস্থ হতে বাধ্য হয়। এই রকম ঢালাও সিদ্ধান্ত বা বিচার, কি সমতলী কি উপজাতির ক্ষেত্রে, যে সব সময় সত্য হবে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু দুই দলের প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনা-মূলক আলোচনা করতে গেলে এই বৈলক্ষণ্যের সূত্রটুকু মনে রাখা ভালো।

সকল প্রতিষ্ঠানের আদি প্রতিষ্ঠান গৃহ-পরিবারের প্রসঙ্গ দিয়েই আলোচনা শুরু করা যায়। এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। অন্যত্র যেমন, উপজাতিদের ক্ষেত্রেও তেমনি, স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য, পরস্পরের সেবা ও সহযোগ বিষয়ে প্রথা-সিদ্ধ নীতিগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট। নারী-পুরুষের বিবাহ সূত্রে পরি-বারের উদ্ভব। স্বামী অথবা স্ত্রীর নির্বাচন বিষয়ে প্রত্যেক উপজাতি-গোষ্ঠীর স্ব স্ব নীতি নির্দিষ্ট থাকে। কোনো কোনো গোষ্ঠী বা পরিবারের মধ্যে বিবাহ সমৃদ্ধ হতে পারে অথবা পারে না, কোন্ বিবাহ প্রশস্ত অথবা পরিহার্য— অথবা কে কাকে বিবাহ করতে পারে বা পারে না— এ সমস্তই কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন।

অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রচলিত এবং তাদের মধ্যে বৈলক্ষণ্যও প্রচুর। তবে তাদের মধ্যে এমন কোনো কোনো অনন্যসাধারণ প্রথা বা নিয়ম আছে— যা বিশিষ্ট বলেই বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য।

সচরাচর পরিবার অর্থে আমরা বুঝি স্বামী, স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততি। কিন্তু হিমালয়ের কোনো কোনো উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায় একই স্ত্রীর একাধিক স্বামী বর্তমান। তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে টোডাদের মধ্যেও এক কালে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। নবজাত কন্যাদের হত্যা করা হত বলে টোডাদের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক পুরুষের তুলনায় পূর্ণবয়স্কা নারীর সংখ্যা কম থাকায় বহুভর্তা ভজনার রেওয়াজ ছিল। সেই প্রাচীন প্রথা আজকাল অবলুপ্ত। শোনা যায় আজকাল সেখানে একই স্ত্রীর বহু ভর্তার পরিবর্তে একাধিক স্বামী একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে যৌন সম্পর্কে তারা ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয়। বাস্তব-পক্ষে স্বামী-স্ত্রীর যৌন-মিলনের ব্যাপারে তাদের অনেকগুলি কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়। স্ত্রীদের যখন সন্তানাদি হয় তখন পিতৃত্ব নির্ধারিত হয় সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, জন্মদাতা সব সময় পিতৃপদবাচ্য সেখানে নাও হতে পারে।

বিবাহ সম্পর্কের ব্যাপার এই একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত দেবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়— এই কথাটুকুই কেবল জোর দিয়ে বলা যে এক গোষ্ঠী যেরকম যৌন আচরণ স্বাভাবিক বলে মনে করে, অন্য গোষ্ঠী তা হয়তো নাও মনে করতে পারে, কারণ তার কাছে নিজেদের প্রথাসম্মত যৌন আচরণই সব চেয়ে স্বভাবসংগত। এ থেকে এইটুকুই প্রমাণ হয় যে নৈতিক দিক থেকে ন্যায়-অন্যায়-বোধ মানুষের তৈরি নিয়মতন্ত্র থেকে উদ্ভূত— সুতরাং তা কৃত্রিম। নিজেদের ছাড়া অন্য অন্য লোকের জীবনযাত্রার ধরন অনুধাবন করতে পারলে একটা উপকার এই হয় যে অন্যদের সম্বন্ধে পূর্ব-নির্ধারিত সংস্কারে মানুষ অনড় অটল আর থাকতে পারে না, মানুষ বুঝতে পারে আচার-আচরণ সম্বন্ধে এমন কোনো বিধিবদ্ধ নীতি কিম্বা আদর্শ থাকতে

পারে না যা পৃথিবীর সকল মানুষের সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ছোটোনাগপুর, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে পরিবার-বহির্ভূত একটি প্রতিষ্ঠান আছে যার প্রভাব ওরাওঁ, জুয়াং, মারিয়া, গোন্দ. নাগা প্রভৃতি গোষ্ঠীর যৌন-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই-সব উপজাতিরা গ্রামের যুব-সমাজের জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন যেখানে তারা একা রাত্রি যাপন করে এবং গোষ্ঠীর প্রতি যেমন কতকগুলি দায়িত্ব পালন করে তেমনি গোষ্ঠীর কাছ থেকে কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করে। কোনো কোনো উপজাতিদের গ্রামে যুবকদের জন্য যেমন শয়নাগার থাকে তেমনি থাকে যুবতীদের জন্যও। ওরাওঁদের গাঁয়ে একটিই শয়নাগার থাকে যুবকদের জন্য।

এই-সব শয়নাগার গাঁয়ের একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করে। এই শয়নাগারই গাঁয়ের অতিথিশালা, এখানেই গাঁয়ের তরুণে প্রবীণে মিলেমিশে আড্ডা দেয় ও খেলাধুলো করে। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের জন্য ধাঁধা হেয়ালি নিয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে, উপজাতি-পুরাণের নানা তত্ত্বও এই-সব আড্ডায় বংশানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়। সেদিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে এই-সব শয়নাগার যেন এক-একটা আবাসিক পাঠভবন। কিন্তু প্রধানত এ-জায়গাটা নির্দিষ্ট থাকে যুবকদেরই জন্য। যুবতীরাও মাঝে মাঝে এসে থাকে নাচগানের জন্য অথবা মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায়। প্রাক্-পরিণয় যৌন-মিলন অনেক গোষ্ঠী দূষণীয় বলে মনে করে না যদি না অপর পক্ষ নিষিদ্ধ-পর্যায়ভুক্ত হয়। তথাকথিত অধিকতর সভ্য সমাজে যৌন-ব্যাপারে যে-সব শাসন বারণ ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের বাড়াবাড়ি থাকে, তা থেকে অনেক পরিমাণে মুক্ত হয়ে উপজাতীয় ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচুর দৈন্য ও অভাব সত্ত্বেও যে উপজাতি সমাজে সাধারণভাবে প্রাণোচ্ছলতা ও আনন্দ দেখা যায় তার অন্যতম

কারণ হয়তো এই যে যৌন-ব্যাপারে তাদের সমাজে অকারণ বিধি-নিষেধের বালাই নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনার অবতারণা করা যায়। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি কী ভাবে সংখ্যালঘু উপজাতি গোষ্ঠীরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দু প্রতিবেশীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়— বিশেষতঃ তাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায়। এই প্রভাব তাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে— সে-সব ক্ষেত্রেও তারা প্রতিবেশীদের সঙ্গে কদম মিলিয়ে চলতে উৎসুক হয়। ফলে বেশ-কিছু উপজাতি নিজেদের কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান পরিহার করে হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠানাদির অনুকরণ করতে চায়। আজকাল তাদের কেউ কেউ যুবক-যুবতীদের শয়নাগার নিয়ে গ্লানি অনুভব করে; অনেকে স্ত্রীপুরুষে মিলে সমবেত নৃত্যের মতো সুন্দর একটি বিনোদন ব্যবস্থাকে বর্জন করে— কারণ আর কিছু নয়, অর্থবলে জনবলে বড়ো, যৌন-ব্যাপারে অতিমাত্রায় গোঁড়া হিন্দু-সমাজ উপজাতিদের এই-সব আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বক্র কটাক্ষ করে থাকে।

উপজাতিদের পরিবার-জীবনে আরো কয়েকটা দিক আছে যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যুবক-যুবতীরা নিজেরাই নিজেদের জীবন সঙ্গী বেছে যেমন নিতে পারে, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাপ-মা সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতেও পারে। কন্যা নির্বাচন করার পর কন্যার বাপ-মাকে বরপক্ষ পণ দেয়, কারণ বিয়ে হলে মেয়ে পরের ঘরে চলে যাবে ও বাপের বাড়িতে খেটে খাওয়া একটি লোক কমে যাবে। কোনো কোনো উপজাতির ক্ষেত্রে এই 'কন্যা-পণ' বেশ মোটা রকম হতে পারে। সে-পণ জোগাতে হলে বর বেচারাকে বেশ কিছুকাল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা জমাবার ধান্দা দেখতে হয়। এই রকম সমস্যার উদয় হলে তিন রকম উপায়ে তার নিরাকরণ করা যায়। বর কনেকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে এই আশায় যে কিছুকাল পরে মুরব্বী ব্যক্তির বিয়েটা মেনে নিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বর তার হবু শ্বশুরের বাড়িতে জন খেটে বছর

কয়েক বাদে কন্যার পাণিপীড়নের উমেদার হতে পারে। তৃতীয়তঃ, পালটা-পালটি ব্যবস্থাক্রমে বরের বোন কনের ভাইকে বিয়ে করতে পারে, তা হলে উভয়পক্ষের দেয় পণের টাকাটা কাটাকাটি হয়ে যায়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুকাল পরে বিয়ে ভেঙে যায়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিয়ে টিকেও যায় আজীবন। বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা তু' পক্ষের আলাদা হয়ে যাওয়া, ঘটে না যে এমন নয়। বিধবাবিবাহে কিংবা এক বিয়ে ভেঙে যাবার পর অন্য বিয়ে করা প্রায়ই ঘটে থাকে। সুতরাং উপজাতি পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর গ্রন্থি-বন্ধন হিন্দুদের তুলনায় কিঞ্চিৎ শ্লথ বলা যায়। কিন্তু তাই বলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় ভালোবাসার সম্বন্ধ উপজাতি-সমাজে তুর্বল— এমন কথা কেউ বলবে না।

পরিবারের পরেই আসে গোষ্ঠী। একাধিক পরিবারের সমষ্টি হল গোষ্ঠী। অনেক সময় দেখা যায় তাদের পারিবারিক নাম একই এবং তাদের ধারণা যে তারা একই পূর্বজের বংশসম্ভূত। একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। কোনো কোনো গোষ্ঠী অপর কোনো গোষ্ঠীকে 'বন্ধু' অর্থাৎ কুটুম্ব গোষ্ঠী বলে মনে করে— সেক্ষেত্রেও তু-পক্ষে বিবাহে বাধা থাকে। বর কিংবা কনে বেছে নিতে হয় আপন গোষ্ঠী কিংবা বন্ধু গোষ্ঠীর বাইরে থেকে— সুনির্দিষ্ট নিয়মতন্ত্র অনুপাতে। আপন পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে যৌন-সংসর্গ বা অজাচার যেমন নিষিদ্ধ, বন্ধু গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধও তেমনি দূষণীয় বলে মনে করা হয়।

বিবাহ-ব্যাপারে গোষ্ঠী গঠনের কার্যকরতা সবচেয়ে বেশি উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু আথিক অথবা বৈষয়িক ব্যাপারে যখন পরস্পর সহযোগের প্রয়োজন হয়— অথবা পরিবারে যখন মৃত্যু ঘটে, তখনো গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে হয়। ওড়িশার কেওনঝর অঞ্চলের মালভূমিতে— যেখানে জুয়াংরা স্থানান্তরী চাষের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে সেখানে দেখা যায় যে এক-একটা গ্রামে সচরাচর একই

গোষ্ঠীর লোক বসবাস করে থাকে। কিন্তু স্থানান্তরী চাষ ছেড়ে দিয়ে একবার হাল-বলদ ধরলেই এই ধরনের গোষ্ঠী-বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।

কিছুকাল হয় লেখক একবার ঢেংকানাল অঞ্চলে পর্যবেক্ষণে গিয়েছিলেন। তিনি তখন লক্ষ্য করেন যে একটি নূতন পত্তন করা জুয়াংগ্রামের মাঝ-বরাবর সোজা রাস্তার দু'ধারে জুয়াংদের কুটির শ্রেণী। ওড়িশার হিন্দু গ্রামগুলিতে সচরাচর এই রকম সোজা লাইনের এক রাস্তাওয়ালা গ্রাম দেখা যায়। কিন্তু গোণাশিকা অঞ্চলে জুয়াংদের বসতি দেখেছি—রাস্তার বালাই নেই কেবল কতকগুলি কুটিরের সমষ্টি যেন যেন তেন প্রকারেণ একত্র জড়ো করে রাখা। দেখেই বুঝতে পারা যায় অনেকগুলি গোষ্ঠী ঘেঁষাঘেঁষি বাসা বেঁধেছে যাতে চাষবাসের জমিতে টান না পড়ে। ঢেংকানালের সেই গ্রামে লক্ষ্য করলাম— যদিচ রাস্তার দু-ধারে দুটি সমান্তরাল রেখায় কুটিরগুলি বিন্যস্ত— এক গোষ্ঠী মাঝে কিছু জমি ছেড়ে রেখে দিয়েছে— অন্য গোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নস্বরূপ। একই গ্রাম —কিন্তু যেন অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টিবিশেষ।

আরো মজার ব্যাপার এই যে আট-দশটি কুটির নিয়ে এক-একটি গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি সবাই পৃথক ; অর্থাৎ এক-একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোক সেই সেই গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতিকেই মোড়ল বলে মানে, অন্য গোষ্ঠীপতিকে নয়। কিন্তু যখন এই গ্রামের সঙ্গে একটা বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কয়েক মাইল দূরের একটা গাঁয়ের কাজিয়া বাধে, তখন গ্রামের তাবৎ জুয়াং তাদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীসত্তা ভুলে গিয়ে এক যোগে অন্য গাঁয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ইতস্ততঃ করল না। তখন গোষ্ঠীপতিদের শাসন আর চলল না, গাঁয়ের নেতা হল এমন একজন যার নেতৃত্বসুলভ গুণ রয়েছে। এ-থেকে বুঝতে পারি হাল-লাঙল দিয়ে যে-সব জুয়াং চাষ করতে শুরু করেছে, তাদের মধ্যে গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য তেমন আর প্রবল নয় এবং সংকট সময়ে তারা একযোগে দাঁড়াতে পারে।

খাসিয়া মা ও ছেলে

স্নান সমাপন অন্তে মিকির তরুণী
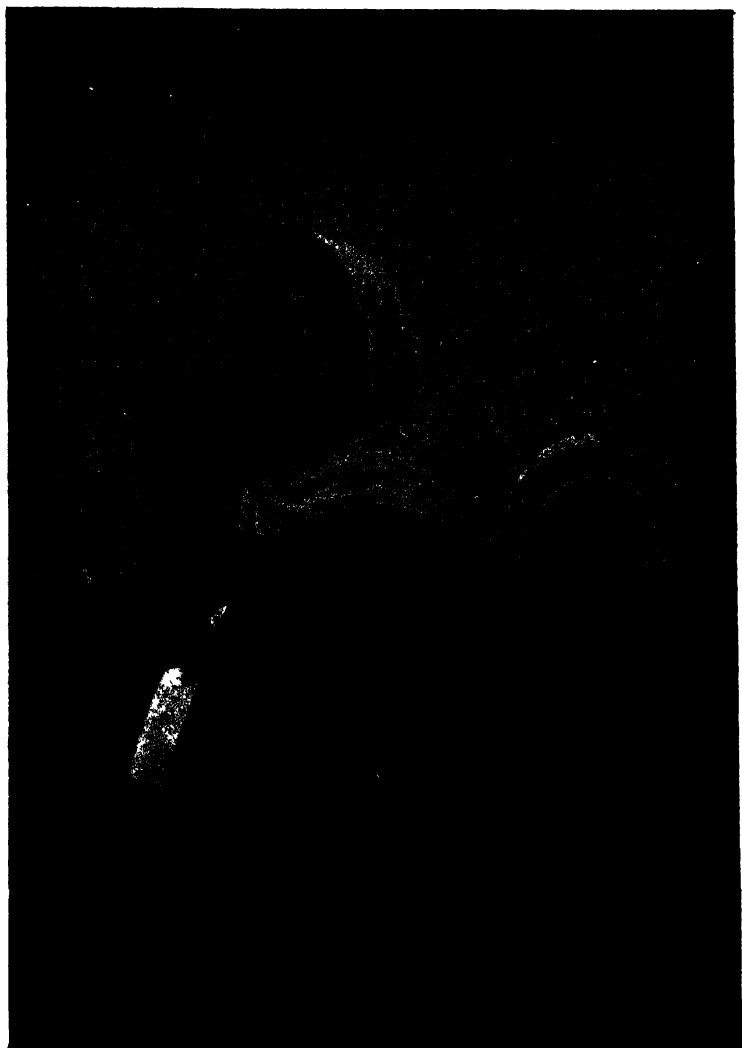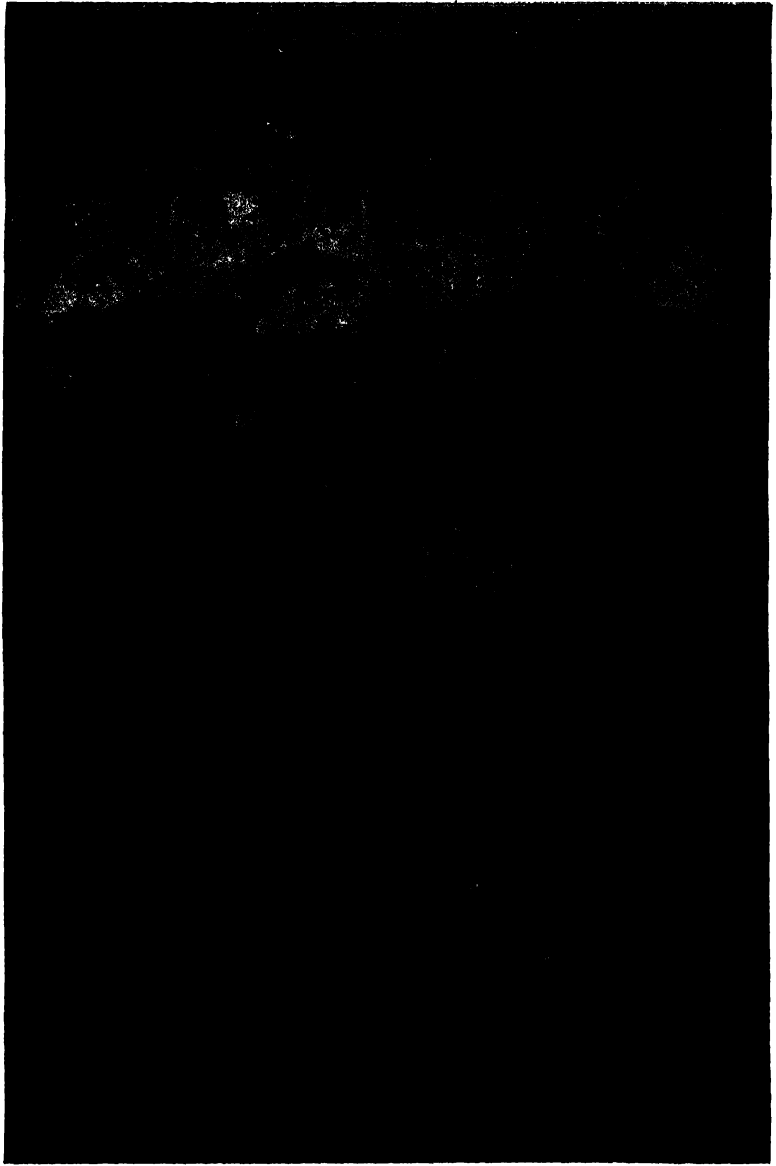
নাগাল্যাণ্ডের কাবুই নাগা
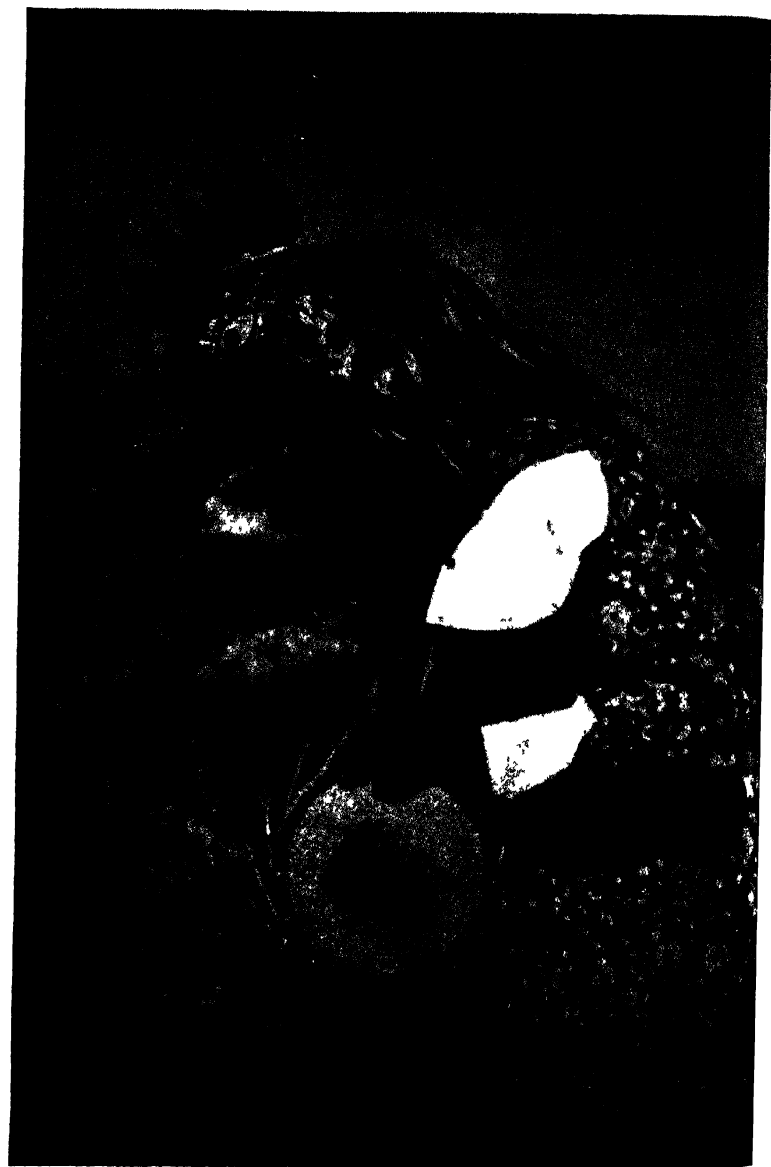
মুখোশ-পরিহিত নাগা ঢোল-বাদক

ছোটোনাগপুরের মুণ্ডাদের মধ্যে এক ধরনের সহজ সরল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রতি গাঁয়ে মোড়ল থাকত দুজন— একজন ধর্মীয় দিকটা দেখত, অন্য জন আর সমস্ত বিষয়। একাধিক গ্রাম মিলে যে অঞ্চল— তার একজন অঞ্চলপতি থাকত তাকে বলা হত মান্‌কি। গাঁয়ের মোড়লেরা সবাই মান্‌কির অধস্তন কর্মচারীর মতো। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল ব্রিটিশ যুগের প্রারম্ভেও। অতঃপর মান্‌কিদের ক্ষমতা বহু গুণে হ্রাস পেয়েছে।

অনুমান হয় প্রতিবেশী জেলা মানভূমের ভূমিজরা আসলে এককালে মুণ্ডা উপজাতি-ভুক্ত ছিল। হিন্দুদের অর্থনৈতিক প্রভাব এদের সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করার পর, উপরিস্তরের ভূমিজরা হিন্দু-সমাজে ক্ষত্রিয়রূপে প্রবেশ লাভ করে। তারা নিজেদের রাজবংশ-সম্ভূত বলে প্রচার করে এবং প্রতিবেশী রাজ-পরিবারদের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করে। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের বিবরণে প্রকাশ পূর্বভারত ও মধ্যভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো উপজাতি-গোষ্ঠী এইভাবে নিজেদের ক্ষত্রিয়-পদবাচ্য প্রতিপন্ন করে, হিন্দু-সমাজের ঐতিহ্য অনুসরণ করে সেই-সব অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। যে-সব উপজাতি-সমাজ সংগঠন-শক্তিতে বলীয়ান্ ছিল ও প্রতিবেশী হিন্দুদের তুলনায় সংখ্যায় গরিষ্ঠ ছিল, তারা এইভাবে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পেরেছিল। অপর পক্ষে যেখানে সংঘশক্তি দুর্বল, যেখানে গোষ্ঠীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ও ভেদাভেদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, বিত্ত বা ক্ষমতা যাদের স্বল্প— সেই-সব উপজাতিরা প্রতিবেশীদের কাছে বাধ্য হয়ে মাথা নত করেছে।

১৯৫০ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকগুলি সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তন করার ফলে উপজাতি-জীবনে বহু পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে। তার ফলাফল বিচার করার আগে এমন কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই যা নাকি নিয়মের অর্থাৎ মূল ঘটনার ধারা থেকে ব্যতিক্রম বলা চলে।

উপজাতিদের বিষয়ে ভারত সরকার পূর্বাপর এমন একটি নীতি অনু-

সরণ করে আসছেন যার মূল উদ্দেশ্য এই যে তারা যেন তাদের স্বভাব, ঐতিহ্য ও প্রবণতা -অনুসারে প্রগতির পথে পা বাড়াতে পারে। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে উপজাতিরা তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিকট অর্থনৈতিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। ত্রিপুরার ত্রিপুরী, মণিপুরের মৈথৈ, আমামের যোড়ো বা কছারী, উত্তর প্রদেশের ভোট অথবা হিমাচল প্রদেশের কনৌর বহু শতাব্দী ধরে তাদের হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। অরুণাচল কিংবা নাগাল্যাণ্ডের সকল উপজাতি সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় না। এমনি আরো অনেকে ভারত ও তিব্বতের যোগাযোগের পথ থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে থাকার দরুন ভারতের মূল জীবন-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। স্বতন্ত্র থাকার ফলে এই-সব উপজাতির সংস্কৃতি এখনো অনেক পরিমাণে অবিমিশ্র রয়ে গেছে।

উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে ভারত সরকার নীতি হিসাবে স্থির করে নিয়েছিলেন যে উপজাতিদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত করা বিধেয় হবে না। সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিল, আসামের তফসিলভুক্ত এলেকায় যে-পরিমাণ স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা রেখেছেন সে-পরিমাণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ভারতের অন্য নাগরিকের নেই। ষষ্ঠ তফসিল অনুসারে উপজাতিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণে জিলা ও অঞ্চল সমিতিগুলিকে প্রভূত অধিকার দান করা হয়েছে। এই দুটি সমিতির সদস্যদের অধিকাংশ উপজাতিদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। উত্তরাধিকারের আইন-কানুন, বিবাহ-ব্যাপার বিধিবদ্ধ করা, কৃষির উন্নতির জন্য ক্ষেত্রান্তরী চাষ ও সেচের জল নিয়ন্ত্রণ— এ সমস্তই সমিতি দুটির অধিকারভুক্ত। এর ফলে যে-সব উপজাতি ভারতের রাষ্ট্রিক জীবন-ধারার সঙ্গে একত্র যুক্ত— তারা পর্যন্ত নিজেদের সমাজজীবনে নিজেদের প্রথা-রেওয়াজ মাফিক যত কাল খুশি চলতে পারে।

বলা বাহুল্য, ষষ্ঠ তফসিল আসামের উপজাতি অঞ্চলেই প্রযোজ্য, ভারতের অন্য অঞ্চলে নয়। যে-সব সঞ্চলে উপজাতিরা অন্যদের

সঙ্গে মিলে মিশে নিতান্ত কাছাকাছি বসবাস করছে, সে-সব জায়গায় অবশ্য একই ধরনের নিয়ম-কানুন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রযোজ্য না হলে অসুবিধা হয়। তবুও এ-সব অঞ্চলেও শিক্ষা, চাকুরি, জমির মালিকানা কিম্বা সমাজ উন্নয়ন -পরিকল্পনায় উপজাতিদের যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সে-অধিকার অন্যেরা পায় না। ১৯৫৯ সনে প্রবর্তিত পঞ্চায়েত-রাজ-প্রকল্প মাফিক জাতি উপজাতি নির্বিশেষে এখন সকলকেই অর্থনৈতিক প্রগতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণে শিক্ষিত করে তোলার জন্য একটি সর্বসন্নদ্ধ পরিকল্পনার অন্তর্গত করার প্রয়াস চলেছে।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার প্রথম ধাপে সচরাচর দেখা যায় যে যে-সব শ্রেণী কিংবা সম্প্রদায় পূর্ব থেকেই সু-সংগঠিত, তারা তাদের সংঘ-শক্তিতে বলীয়ান্ হয়ে অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা অধিকার করে বসে। কিন্তু কালক্রমে উপজাতিরা যখন জানবে ও বুঝতে শিখবে সংবিধান তাদের কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেছে, তারা তখন দাবি করবে দেশের বিত্ত-সম্পদ ও দেশ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যেন অধিকতর সমানভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়, সুযোগ-সুবিধা তারাও যেন সকলের সঙ্গে সমভাবে ভোগ করতে পারে। আজ যদি তারা কখনো কখনো নিজেদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দাবি করে, যদি বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই তারা তাদের প্রাপ্যের অধিক চায়— তা হলে সে-ব্যাপারটা নিতান্তই সাময়িক বলে ধরে নেওয়া উচিত। কালে তারা দাবি করবে প্রশ্রয়ের পরিবর্তে সমতা। তখন তারা ভারতের অন্য নাগরিকদের সঙ্গে একযোগে গড়ে তুলবে নয়া একটি সমাজ যেখানে কেউ বড়ো, কেউ ছোটো নয়— সবাই যেখানে সকলের সমান হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

উপজাতি-জীবন সম্বন্ধে যা তাৎপর্যপূর্ণ সে হল এই যে রাষ্ট্রিক কিংবা সামাজিক দিক্ থেকে তারা নিজেদের জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান পুরাকালে গঠন করেছিল, নূতন যুগের দাবিতে সেগুলির দ্রুত

রূপান্তর ঘটছে। কেবল উপজাতি সম্বন্ধে নয় ভারতবাসী অন্যান্য সমস্ত নাগরিকদের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়।

আদিতে উপজাতি-সম্প্রদায়গুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সেই বিভক্ত বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থায় তাদের উপর হিন্দু-সমাজের ও হিন্দুদের অর্থনৈতিক আদর্শের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল। আমরা দেখেছি এরই ফলে উপজাতিদের মধ্যে থেকে ক্ষাত্র-অভিমানী রাজবংশেরও উদ্ভব হয়েছিল এক কালে। তারা রাজত্ব করেছে আবার জমির মালিক হয়ে জমিদারিও করেছে। আইনের নূতন করে যে-সব সংস্কার সাধিত হচ্ছে তার ফলে এই-সব বংশানুক্রমিক ভূম্যধিকারীর অস্তিত্ব আর থাকছে না— তা তারা উপজাতির হোক্ আর কিংবা নাই হোক্। এই বিরাট দেশব্যাপী পরিবর্তনের মধ্যেও আইনে সংবিধানে এমন-কিছু ধারা রাখা হয়েছে যার জোরে ইচ্ছা করলে উপজাতিরা তাদের উপজাতি পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা লক্ষ্যগোচর হচ্ছে তা হল এই যে ছোটো ছোটো উপজাতি দল এখন তাদের পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে একত্র যুক্ত হচ্ছে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে। বয়স্কদের ভোটাধিকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তি যে কতখানি সে-বিষয়ে তারা এখন সম্পূর্ণ সজাগ, তারা এখন উন্নততর প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য নিজেরা মিলে মিশে 'যুক্ত ফ্রণ্ট' পর্যন্ত গঠন করতে লেগেছে।

এইরকম মানসিকতা থেকে ছোটোনাগপুরের বিভিন্ন উপজাতিরা একত্র যুক্ত হবার উপক্রম করছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের যে ছ-সাতটি বিভিন্ন উপজাতিকে আমরা ভুল করে 'নাগা' বলে অভিহিত করে থাকি, তাদের প্রত্যেকের নাম আলাদা। কিন্তু আলাদা নাম হলে কী হয়, আজ রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তারাও একত্র যুক্ত। রাষ্ট্রীয় জোট বাঁধার তাগিদটা যখন জোরদার কিংবা জরুরি হয়, তখন সংশ্লিষ্ট দলগুলির সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি— এমন-কি, জোটের বিভিন্ন শরিকের

মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা— সবই দ্রুত পরিবর্তনের সম্মুখীন হবে এতে আর আশ্চর্য কি !

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রগতির এই দ্রুত পট-পরিবর্তনের মুহূর্তে উপজাতিদের মধ্যে কী ভাবে বিবর্তন পরিবর্তন ঘটছে তার চুলচেরা হিসাব অথবা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ উপস্থাপিত করার সময় এটা নয়। পরিবর্তন কোন্ পথে মোড় নিচ্ছে মোটামুটি সেটুকু দেখলেই আপাততঃ যথেষ্ট।

ধর্ম
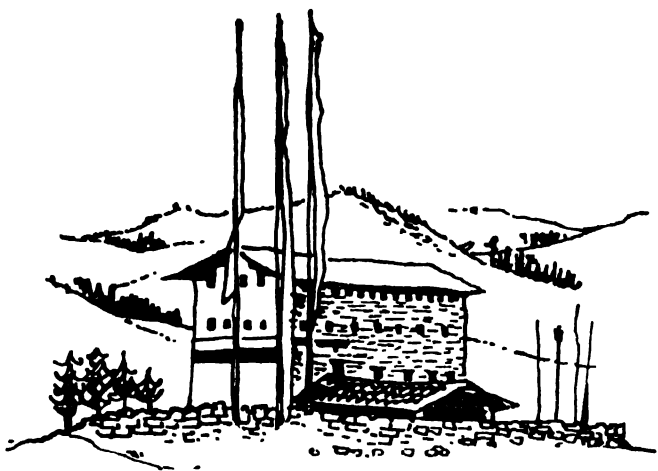
বলা হয় কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি করে মানুষের জীবনধারণে তৃপ্তি হয় না। খুবই সত্য কথা। রুজি-রোজগার ও প্রতিদিনের সমস্যা সমাধান করে পৃথিবীর কোনো জনসমাজ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না— তা তাদের সমাজ যতই সহজ সরল হোক কিংবা যতই জটিল বাস্তব বুদ্ধি-সম্পন্ন হোক্। সকল সমাজ অতীতের নাগাল পেতে চায়, হাতড়িয়ে দেখতে চায় ভবিষ্যতের সঙ্গে কী সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অব্যবহিত বর্তমানের ঘটনায় তারা অতীতের পূর্বানুস্মৃতি দেখে এবং অতীত ও বর্তমানের ভিত্তিতে অস্পষ্ট ভবিষ্যতের আশা-আশঙ্কার একটা আবছায়া ছবি কল্পনা করে নিতে চায়। ত্রিকালের এই ধারণা নিয়ে গড়ে ওঠে তাদের বিশ্ববোধ।

এই বিশ্ববোধ ত্রিকালের যে-সব উপাদান দিয়ে গঠিত, সেই-সব উপাদানের গুণাগুণ কিংবা তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রতি-নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে বলে বিশেষ বিশেষ জন-সমাজের বিশ্ববোধও বদলায়— অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য অনড় অটল হয়ে থাকে না।

কিন্তু দেখা যায় পৃথিবীর প্রত্যেক জন-সমাজ যে যেখানে থাকুক-না কেন, সকলেই আত্মার এমন একটি ধ্রুব আশ্রয়-স্থল সন্ধান করে নিতে চায় যেখানে দাঁড়িয়ে তারা দৈনন্দিন সকল কর্ম সকল মননে নির্দেশ লাভ করতে পারে। সচরাচর লোকে এজন্য দুটি প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে: প্রথমত, তাদের বিশ্বাস কেবল ইন্দ্রিয়-লব্ধ অনুভূতি কিংবা সাধারণ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সত্যকার জ্ঞান লাভ করা যায় না; দ্বিতীয়ত, সেই পরাজ্ঞানের অনেকখানি আসে কাব্যময় কল্পনা কিংবা অতীন্দ্রিয় এমন কোনো উৎস থেকে যাকে প্রত্যাদেশ বলে অভিহিত করা যায়।

প্রত্যাদেশ-লব্ধ এই জ্ঞান যে সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না, এই জ্ঞান যে অন্যদের তর্কবিচারের অতীত, কেবল ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ যে এই জ্ঞানের অংশভাক হতে পারে— এরকম একটা ধারণা থাকায় প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানকে মনে করা হয় অখণ্ডনীয় ধ্রুব সত্য। প্রত্যাদেশ যাঁরা লাভ করেন তাঁরা তাঁদের লব্ধ সত্যকে উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের দ্বারা মণ্ডিত করে দেন। ধর্মবিশ্বাসের অন্তঃস্থিত শক্তি এমনি প্রবল যে ধর্মীয় বিশ্ববোধ থেকে লব্ধ সংজ্ঞা বা অনুমান দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা অথবা ইতিহাসের ঘটনার ব্যতিক্রম হলেও, সে-বিশ্বাস সহজে টলে না।

জ্ঞান-পিপাসুদের মধ্যে যাঁরা সমালোচক-শ্রেণীভুক্ত তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে প্রত্যাদিষ্ট অথবা কল্পিত বিশ্ববোধের মধ্যে ভাবাবেগের যে উচ্ছ্বাস— তা রূঢ় বাস্তব থেকে মানুষের পলায়ন-প্রবৃত্তির অন্যতম প্রকাশ। ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন ধর্ম সেই বস্তু যা অহিফেনের মতো মানুষের বিবেক ও বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ধর্মবোধ কিংবা বিশ্ববোধকে এভাবে ঘুমের ওষুধ বলে সংক্ষেপে বরখাস্ত করার মতো কোনো সংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ বিরুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগ করে প্রমাণ করা যায় যে ধর্মীয় ভাব মানুষের বিচিত্র সৃজনী প্রতিভার দরজা খুলে দেয়। ইতিহাসের নজির থেকে দেখা গেছে যখন কোনো

জাতি অব্যবহিত ঘটনার চোরাবালিতে পা ডুবিয়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তখন তাৎকালিক অভিজ্ঞতার অতীত কোনো বিশ্ববোধের উপর নির্ভরশীল হয়ে তারা বর্তমানের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে এবং নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভায় বিকশিত হয়ে নিজেদের দেশ তথা বিশ্বকে নূতন করে গড়ে তুলেছে। ইতিহাসে এরকম সাক্ষ্য প্রচুর পাওয়া যায়।

মনে হয় বর্তমানের পৃথিবী সেই সংকটময় ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে চলেছে। মনে হয় পৃথিবীর সর্বত্র নূতন কোনো বিশ্ববোধের উপর নির্ভরশীল হয়ে এগিয়ে যাবার জন্য একটা ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে। এই নূতন বিশ্ববোধ কেমন রূপ পরিগ্রহ করবে আমরা জানি না, আবছাভাবে আমরা কেবল এইটুকু জানি এর গতি ও প্রেরণা আসছে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও মানবিকতার নবচেতনা থেকে। এই প্রত্যয়ের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় এর উদ্ভব ব্যক্তির অন্তর্নিহিত আশা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে ও সমানধর্মা সমষ্টির নিকট সংসর্গ থেকে। এই প্রত্যয়ের সপক্ষে ইতিহাসের যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে অর্থাৎ ইতিহাসের শিক্ষাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে যেন তা মানুষের অন্তর্নিহিত আশাকেই প্রতিফলিত করে। কিন্তু নিরপেক্ষ যুক্তির বিচারে এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ মেলে না যে শেষ পর্যন্ত মানুষই জয়ী হবে, বিশ্ব-ব্যাপারে মনুষ্যেতর প্রাণী মানুষকে হটিয়ে দেবেন। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্বে যদি এরকম সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়ে থাকে, তা হলে দেখা যাবে এই প্রত্যয়ের পিছনে রয়েছে সৃষ্টির সকল প্রাণীর উপর জয়ী হয়ে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের স্থির সংকল্প। ইতিহাস কিংবা বিশ্বপ্রকৃতি এরকম অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা বিষয়ে নীরব।

ধর্মবিশ্বাসের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে উপরোক্ত ভূমিকার অবতারণা করা হল এই উদ্দেশ্যে যে সভ্য সমাজ যেমন, উপজাতি-সমাজের সহজ সরল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও এই-সব প্রত্যয়ের পরিচয়

হিমাচল প্রদেশস্থিত লাহোলের রমণী

লাহোলের মেয়েরা বরফ ঢাকা পথে চলার জুতো তৈরী করছে

লাংহালের ছেলেমেয়েরা শস্য পেষণ করছে

লাহোলের মেয়েরা শস্য ঝাড়ছে

পাওয়া যায়। তবে কি উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই? পার্থক্য আছে বই-কি। কিন্তু তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার হয় প্রায়ই তার ফলাফল দিয়ে। সে-বিচারের মান সব সময় যুক্তিসংগত হয় কিনা— সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কথাটা ভালো করে বুঝবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্।

এক ধর্মমত বলে যে ভগবানের চোখে সকল লোকই সমান হতে পারে, কিন্তু তোমার নিজের ধর্মাবলম্বী যারা, তারা তোমার যতটা আপন অন্যেরা ততটা নয়। এমন ধর্মমতকে আমরা সংকীর্ণতা-দুষ্ট বলে থাকি। অন্য ধর্মমত হয়তো বলে সকল মানুষ ভাই ভাই— তা তাদের ধর্ম যাই হোক্-না কেন। এমন ধর্মমতকে আমরা বলি উদার। আমরা বলি যে ধর্মে উদারতা আছে তা সংকীর্ণতা-দুষ্ট অনুদার ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভারতে যেমন অন্যান্য দেশেও তেমনি বিশ্ব-প্রেমিক সাধুসন্তের উদয় হয়েছে। তাঁরা কেবল যে শত্রুকে মিত্রবৎ গ্রহণ করেছেন এমন নয়, বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি— এমন-কি, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতার প্রতিও— তাদের প্রেম ও করুণা সমধারে প্রবাহিত হয়েছে। প্রয়োগের দিক থেকে ফলাফল বিচার করে দেখলে মনে হয় এই প্রকার বিশ্বজনীন ধর্ম নিশ্চিতভাবে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু কোনো ধর্মের উৎকর্ষ বিচার করতে গেলে উপরোক্ত মানদণ্ড সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিংবা যুক্তিসহ হবে কিনা— সে এক পৃথক সমস্যা এবং তার উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। মানুষ তো তার আশা-আশঙ্কার মাঝেই— নিজ নিজ মাপকাঠি তৈরি করে নেয়। সেইজন্য উপ-জাতিদের ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে বিচার করতে গেলে সর্বাগ্রে ব্যক্তিগত সংস্কার বা পক্ষপাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে হয়— অন্ততঃ পক্ষে তড়িঘড়ি মতামত প্রকাশের অস্থিরতা দমন না করলে চলে না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে ব্যাসদেব একটি খুব বড়ো সত্য প্রচার করেছেন : ভক্ত যদি শ্রদ্ধাভরে ভগবানের চরণে একটি মাত্র ফুল কিংবা এক অঞ্জলি জলও নিবেদন করে, ভগবান

ভক্তের সেই পূজা গ্রহণ করে থাকেন। উপজাতি-সমাজের ধর্মানু-ষ্ঠানের বহিরঙ্গ বিষয়ে ভালোমন্দ কোনো মতামত প্রকাশ করা থেকে আমরা তাই বিরত থাকব, এই-সব ধর্মাচবণের মোটামুটি—বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক কালে তার যে রূপান্তর ঘটেছে তারই একটি ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

ভারতের উপজাতিসমূহের ধর্মমতে একটি উল্লেখযোগ্য সেই সাদৃশ্য দেখা যায়— তারা বিশ্বাস করে সর্বভূতের মধ্যে প্রাণবন্ত সর্বভূতাত্মা বিরাজমান— তিনি জীবজন্তু পশুপক্ষী অরণ্য বনস্পতিতে যেমন আছেন, তেমনি আছেন নদনদীতে পাহাড়ে পর্বতে। মৃত্যুর পর আপাতদৃষ্টিতে যাঁরা পরলোকে চলে গেছেন বলে মনে হয়, তাঁরা আমাদের সঙ্গে ইহলোকেই যুক্ত থাকেন। নির্দিষ্ট আচার ও অনু-ষ্ঠানেব মধ্য দিয়ে যখন আমরা তাঁদের স্মরণ করি, তাঁদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করি, তখন নূতন করে তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগা-যোগ ঘটে। তখন বর্তমান প্রজন্মের নবজাতকেব মধ্যে তাঁরা জন্ম পরিগ্রহ করে থাকেন। এইভাবে দৃশ্যমান্ সকল বস্তুর সঙ্গে, এমন-কি, আপাত-দৃষ্টিতে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার ধনের সঙ্গে, মানুষের সৌভ্রাত্র-সম্বন্ধ প্রসারিত হতে থাকে।

উপজাতীয় ধর্মমত অথবা এই সর্বপ্রাণবাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের মুণ্ডা, ওরাওঁ এবং সাঁওতাল ভাইরা এই কথাই বলতে চায় যে বিশ্বের সর্বত্র সর্বভূতাত্মা বিরাজ করেন বলে সকল বিশ্বই পুণ্যভূমি। অরণ্যে যে-সব আরণ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠিতে বসবাস করে, তারা বিশেষ কয়েকটি গাছে হাত দেয় না বা কাটে না— মনে করা হয় সেই-সব গাছ হল সেই অরণ্যের আদিপুরুষ আদি জননী। প্রয়ো-জনের তাগিদে মানুষ যে জঙ্গল সাফ করেছে কিংবা ডালপালা কেটে জ্বালানি করেছে— এ-সব গাছ তাদেরই জনক-জননী, সমস্ত অরণ্যের প্রতিভূ। পাহাড় পর্বতও পবিত্র— সেইজন্যই তো কত বিচিত্র আকারের পাথর দেখা যায়, কোনো কোনো পাথরের আবার কত অদ্ভুত রঙ, পবিত্র না হলে কি এত বৈচিত্র্য দেখা যেত!

ভূতাত্মারা যদি সর্বত্র বিরাজ করেন এবং মানুষ যদি তাদের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, তা হলে মানুষ নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়। কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয় তা হলে বুঝতে হবে 'তাঁদের' কাউকে লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে 'তিনি' ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তখন ওঝা ডাকা হয়, সে মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক করে বলে দেয় রোগাক্রান্তকে কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করতে হবে। সেই বিধান যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, তা হলে হৃতস্বাস্থ্য নিরাময় হয় বলে এদের স্থির বিশ্বাস।

অপেক্ষাকৃত উন্নত সম্প্রদায়েরা কোনো বিশেষ একটি জায়গার চারিদিকে দেওয়াল তুলে চারটি স্তম্ভের উপর ছাদ বসিয়ে তাকে দেবস্থান বলে চিহ্নিত করে দেয়। কিন্তু সর্বপ্রাণবাদী উপজাতিদের কাছে সকল স্থানই পবিত্র কারণ ভূতাত্মা সর্বত্র বিরাজ করেন। কেউ কেউ অনুযোগ করে বলেন তাদের ভারি ভূতের ভয়, সর্বক্ষণ তারা প্রেতাত্মার ভয়ে সন্ত্রস্ত। এ-অনুযোগের কোনো সংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। ভরসা ও ভয় সকল লোকের মনেই আছে, উপজাতিদের ধর্ম থেকে কয়েকটা উপাদান বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যদি বলা হয় ভয় তাদের নিত্যসঙ্গী, তা হলে তাদের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়।

যে ধর্মবিশ্বাস দৃশ্যমান জগতের সব-কিছুর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা সাধন করে, যা মানুষের সৃজনী শক্তিকে বিকশিত করে দেয় আন্তরিকতাপূর্ণ সুন্দর উৎসব-অনুষ্ঠানে, কখনো কখনো ভাবসমৃদ্ধ কবিতায় ও গানে, কৃত্রিমতাবর্জিত সহজ সরল শিল্পকর্মে— তা কখনো মানুষের পূর্ণ বিকাশকে ব্যাহত বা অবরুদ্ধ করতে পারে না। সুতরাং এ প্রকার অভিযোগের কোনো অর্থ হয় না।

নাগারা এক কালে শত্রু নিপাত করে নরমুণ্ডের মালা গৃহসজ্জারূপে ব্যবহার করত, কন্ধ্‌রা অধিক ফসলের আশায় দেবী বসুমতীর উদ্দেশে নরবলি দেওয়া প্রশস্ত মনে করত— এ-সব নিয়ে আজ যদি আমরা তাদের নিন্দা করি, তা হলে 'নেশন' কিংবা শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের

জন্য যে-সব তথাকথিত সভ্য সম্প্রদায় হাজার হাজার মানুষ মেরে বলে ধর্মযুদ্ধ করছি— তাদের তা হলে কি প্রশংসার যোগ্য মনে করতে হবে? উপজাতিদের ধর্ম যদি কুসংস্কারদুষ্ট হয়, অন্যদের ধর্ম কি সর্বাংশে শুদ্ধ ও পবিত্র বলা যায়? প্রত্যেক জাতি উপজাতি এ-সব ব্যাপারে নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে মনে করে তারা যেটা করে সেটাই ঠিক। বাস্তবপক্ষে মানুষের সম্প্রদায় মাত্রই— তা সে সুসভ্য হোক্ কি অসভ্য হোক্— নানাপ্রকার কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বছরে কয়েকটা দিন অপবিত্রের স্পর্শবর্জিত কোনো কোনো জায়গায় সমবেত হয়ে ধর্মের উচ্চতর আদর্শ নিয়ে মগ্ন থাকেন বলে দাবি করেন— এই মাত্র।

উপজাতিরা সুসভ্য জাতিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন কথা আমরা বলতে চাই না। আমরা সকলে একই কালিতে কলঙ্কিত। সুতরাং যখন আমরা আমাদের নিজেদের বিশ্ববোধ অন্যান্য সহজ সরল মানুষের বিশ্ববোধের সঙ্গে তুলনা করতে বসি, তখন যেন আমরা একটু নম্র হই, নিরভিমান হই। তা হলে তাদের ধর্ম সম্বন্ধে যেমন আমাদের নিজেদের ধর্মসম্বন্ধেও তেমনি, আমাদের বিচারবোধ গভীরতর হতে পারে।

অপরাপর ধর্মের লোকের সঙ্গে সংস্পর্শে আসার ফলে উপজাতিদের মধ্যে একটি ব্যাপার ঘটেছে যার উল্লেখ এখানে করা দরকার। এ-কথা সত্য যে উপজাতিরা দরিদ্র, শিক্ষার সুযোগ তারা পায় না, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই বলে তারা অনেক বিষয় নিয়ে ভয় পায়। উপজাতি নয় এমন সব সমাজের নিচু তলায় যে-সব হতভাগ্য থাকে তারাও এ-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। একশো বছরেরও বেশি কাল ধরে উপজাতিদের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে খ্রীস্টীয় মিশনারীরা এদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন উপজাতিরা সরল বিশ্বাসী এবং সেই কারণেই ধর্মান্তরকরণের পক্ষে উপজাতি অঞ্চল উর্বর ও প্রশস্ত। উপরন্তু মিশনারীরা লক্ষ্য করেছেন তাঁদের নিজেদের দেশে নামে-খ্রীস্টান গরিব

বস্তিবাসীদের মধ্যে কাজ করে যতটা না সাফল্য ও সন্তোষ লাভ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায় ভারতের উপজাতি অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করে। তার অন্যতম কারণ এই যে একবার ধর্মান্তরিত করতে পারলে এরা সত্য সত্য ধর্মপ্রাণ হতে পারে, এদের সরল প্রাণ ধর্মের ডাকে সহজেই সাড়া দেয়।

খ্রীস্টান ধর্ম উপজাতিদের কাছে এক সমৃদ্ধতর জীবনের বাণী বহন করে এনেছে, অন্য খ্রীস্টানদের সঙ্গে আত্মীয়সম্বন্ধের সুযোগ দিয়েছে এবং ধর্মান্তরীদের প্রাণে এনেছে নূতন গরিমা। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তারা আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার নানারকম সুযোগ লাভ করেছে। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব যখন কায়েম ছিল, তখন এ-সুযোগ আরো সহজে পাওয়া যেত বলে ধর্মান্তরীরা নিজেদের মনে করতে পারত যে তারা রাজার জাতের জাতভাই এবং তুলনায় তাদের স্বদেশবাসীদের চেয়ে তারা বেশি ভাগ্যবান্। তাদের মধ্যে যাদের অবস্থা স্বচ্ছলতর, তারা পোশাকে-আশাকে, আহারে-বিহারে পশ্চিমী কেতা গ্রহণ করেছিল, শিক্ষার উন্নতি হওয়ায় তাদের জীবনযাত্রার ধরন উন্নততর হয়েছিল, প্রাচীন-কালের গাছগাছড়া জড়িবুটির ওষুধের বদলে তারা আধুনিক এলোপ্যাথির শরণ নিয়েছিল। এখানে একটা প্রশ্ন তোলা হয়তো অবান্তর হবে না খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী কেতা গ্রহণ করা কি অনিবার্য ছিল? তা হয়তো ছিল না, কারণ খ্রীস্টান হলেই আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে মানুষকে যে উৎখাত করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নিশ্চয় থাকতে পারে না। তথাপি দেখা যায় উপজাতিদের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রচলন অর্থাৎ যাকে আধুনিকীকরণ বলা হয়, তা সম্পূর্ণত এসেছে মিশনারী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। কেবল ভারত স্বাধীন হবার পর মিশনারীদের তথা ভারতীয় খ্রীস্টানদের ভাবধারায় একটা সুস্থ পরিবর্তন এসেছে বলে দেখা যায়। এখন বরঞ্চ চেষ্টা হচ্ছে ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও মানুষ যেন পূর্বপুরুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে উপজাতিদের সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের— খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক— তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্তরকরণের প্রথা নেই, আজ যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলে অভিহিত করি তা অনেকাংশে গড়ে তুলেছিল এদেশেরই আদিবাসিরা। উপজাতিরা তাদের নিজেদের ধর্মের মুখ্য আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ না করেও হিন্দুসমাজের অন্তর্গত হতে কোনো বাধা ছিল না। অবশ্য এ-সব আচার-অনুষ্ঠানে কমবেশি অদলবদল হত না যে এমন নয়। উপরন্তু উপজাতিরা হিন্দুদের কোনো কোনো দেবদেবীকে নিজেদের বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করে নি। হিন্দুরা বামুন পুরুতের সাহায্যে যে-সব পুজোআচ্চা করত, ধর্মান্তর গ্রহণ না করেও উপজাতিদের সেই-সব উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার পক্ষে বাধা ছিল না। যোগ দিলেই তারা হিন্দু হয়ে যাবে— এমন আশঙ্কাও ছিল না। যে-সব উপজাতি জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ— এই তিনটি প্রধান সংস্কার ব্রাহ্মণ্য আচার অনুসারে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে সম্পাদন করায়, একমাত্র তাদের বিষয়েই বলা চলে যে তারা পুরোপুরি হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অপর পক্ষে এই-সব সংস্কার যদি এখনো তাদের নিজস্ব প্রথামতে সম্পন্ন হয় তা হলে বলতে হবে নিজস্ব ধর্মে তাদের আস্থা এখনো অবিচল, হিন্দুদের উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ·দেবার ফলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রান্তসীমায় দু-চারটে ছোটোখাটো ঢেউ এসে লাগলেও।

অতীতে এদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের যে-সম্পর্ক ছিল তা যদি দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা যায়, তা হলে কথাটা আর একটু স্পষ্ট হয়। আজকের দিনেও দেখা যায় বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী ও রাজস্থানে অনেকগুলি মুসলমান পীরের দরগা আছে যেখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তেরা এসে বাতি জ্বালায়, সিন্নি দেয়— এবং তাতে তাদের ধর্মে আটকায় না। অনতিদূর অতীতে মুসলমানেরা হিন্দুদের বসন্ত-উৎসব হোলিতে দলে দলে যোগ দিত। হিন্দুরাও

মহরম উৎসবে তাজিয়া বহন করত ও লাঠিখেলায় প্রতিযোগিতায় যোগ দিত। উৎসবে যোগদানের ব্যাপারটা উভয় ক্ষেত্রেই ঘটত সামাজিক স্তরে— এতে ধর্মান্তর গ্রহণের কোনো প্রশ্নই উঠত না।

হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে উপজাতিদের যোগাযোগটা ঘটে এই সামাজিক পর্যায়েই— অবশ্য যদি না কেউ কেউ তাদের হিন্দু-সমাজভুক্ত না হয়ে থাকে। হিমাচল প্রদেশের কিন্নৌর অঞ্চলে কিন্নৌররা, অরুণাচলের কামেং অঞ্চলের মোংপারা এবং সংবিধানের তফসিলভুক্ত আরও অনেক তফসিলী উপজাতি এইভাবে হিন্দু-ধর্মের কিংবা বৌদ্ধধর্মের— অথবা উভয় ধর্মেরই খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। অথচ দেখা যায় তাদের মেয়েদের মধ্যে বহুভর্তাগ্রহণের প্রথা আজও বর্তমান। এইরকম প্রথা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এখনো তারা প্রতিবেশী সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে মিশে এক হয়ে যায় নি।

ডঃ অন্নদা ভগবতী নামে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ নৃ-বিজ্ঞানী একই অঞ্চলে একাধিক সংস্কৃতির সহাবস্থানের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। হিমালয়ের পাদদেশে একটি বাজারে বছরের একটা সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কিছু পার্বত্য জাতি পশম, মৃগনাভি, চমরীর লেজ, শিলাজতু প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে বাণিজ্য করতে আসে। ঠিক সেই সময়ে সমতলবর্তী হিন্দুভাবাপন্ন কিছু উপজাতিও উঠে এসে জড় হয় এই হাটে লবণ প্রভৃতি বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে। বাজার বা মেলা চলতে থাকে প্রায় একমাস ধরে। অনেক পণ্য বেচাকেনা হয়। কিন্তু হাট বসবার ঠিক আগে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি পাথরের স্তূপের সামনে পূজা দেয়। বুদ্ধ অথবা বোধিসত্ত্বের স্তূপ জ্ঞানে পার্বত্য উপজাতি তিব্বতী লামাদের অনুকরণে পূজা দেয়, সমতলের উপজাতি পাথরের স্তূপে পূজা দেয় শিবলিঙ্গ জ্ঞানে। দুই পক্ষের দুই ধরনের পূজা দেওয়া হয়ে গেলে পর প্রচলিত কতকগুলি নিয়ম অনুসারে বেচাকেনা শুরু হয়।

ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে এ-দুই উপজাতিকে বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু

বলে মনে হলেও এরা কিন্তু তাদের পাথর পূজার পুরাতন প্রথা এখনো ছাড়তে পারে নি। সভ্য জগতের ধর্ম যেন তাদের পোশাকী ধর্ম, অন্তরে অন্তরে যেটা প্রবল সে হল তাদের স্বধর্ম— তাদের আদিম সংস্কৃতি। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সূত্রে মনে রাখা দরকার— যত দূর জানা যায় সমতলী উপজাতির ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা যজমানী করে না। তাদের নিজেদের পুরোহিত আছে যে নাকি তাদের প্রথা অনুসারে ক্রিয়াকর্ম উৎসব-অনুষ্ঠানাদি করে থাকে। তবুও এরা যদি নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করে, অন্য কোনো হিন্দু তাতে আপত্তি করে না, কারণ হিন্দুধর্মের বিস্তার এত বেশি যে তার একদিকে উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাসকে স্থান দিয়েও অপর দিকে মনন দর্শনের স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠাকেও সে স্থান দিতে পারে। হিন্দুসমাজের গঠনে জাতিভেদ নামে এমন একটি অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা আছে যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেও সংঘবদ্ধ অথচ ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের কোথাও না কোথাও নিজেদের ঠাঁই করে নিতে পারে। কিন্তু সেমিটিক বংশপ্রসূত খ্রীস্টান অথবা মুসলমান ধর্মে সেরকমটি হবার জো নেই, সেখানে ধর্মান্তরের অর্থ সুস্পষ্ট, সেখানে নিজেকে খ্রীস্টান বা মুসলমান বলে দাবি করলেই খ্রীস্টান বা মুসলমান হওয়া যায় না।

উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের সংবিধানে তফসিলভুক্ত উপজাতিদের বিশেষ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে এ কথা পূর্বেই বলেছি। এই-সব সুবিধা পাবার জন্যই হোক্ কিংবা অন্য কারণেই হোক্, উপজাতীয়দের মধ্যে (এমন-কি, পশ্চিমী ভাবাপন্ন ধর্মান্তরী খ্রীস্টানদের মধ্যেও) তাদের নিজ নিজ উপজাতি পরিচয় নূতন করে আবিষ্কার এবং ঘোষণা করার জন্য আর সেইসঙ্গে তফসিলভুক্ত যারা নয় তাদের থেকে উপজাতিরা যে পৃথক্ সেই কথা প্রচারের জন্য, একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। এই চেষ্টার মধ্যে অন্যায় কিছু আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু উপজাতি সম্প্রদায়ের ধর্ম বিষয়ে বলতে হলে তাদের নিজস্ব ধর্মের মত ও আচারের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে

হিমাচল প্রদেশস্থিত চম্বাব গদ্দী মেষপালক

ছাগলের পাল সহ গদ্দী রাখাল

চম্বা অঞ্চলের কুগটিতে গদ্দী গ্রাম

গদ্দী তরুণীদ্বয়
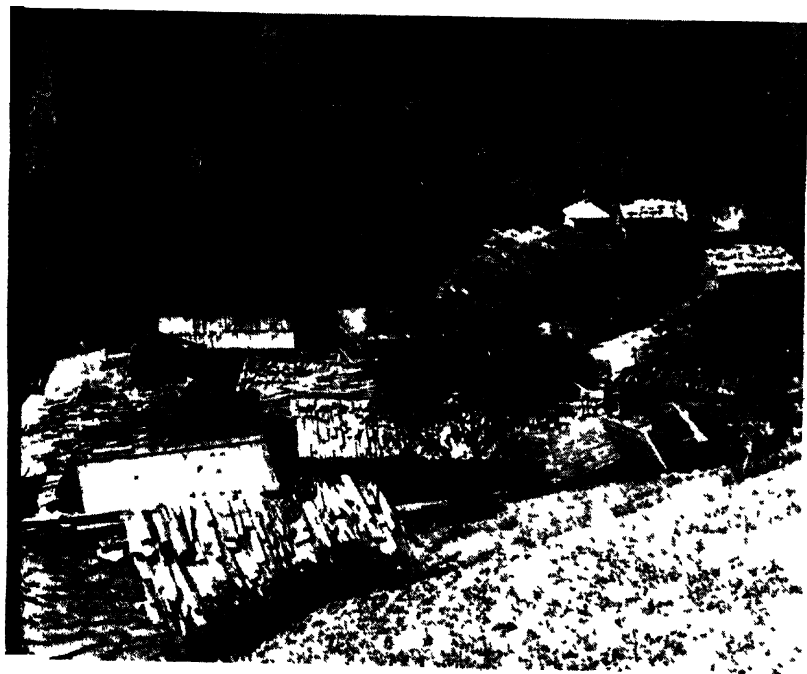
বললে যথেষ্ট বলা হয় না। সেইসঙ্গে বলতে হয় তাদের অপেক্ষা উন্নততর ও সম্পন্নতর প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে ও প্রভাবে আসার ফলে কত বিচিত্র পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তাদের জীবনে। কখনো খুবই মন্থর গতিতে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের দিকে তারা ঝুঁকেছে, কখনো ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টান মিশনারীদের একান্ত চেষ্টার ফলে পশ্চিমী ভাবাপন্ন হবার জন্য তাদের আকর্ষণ কিছু কম হয় নি। বর্তমানে নিজেদের উপজাতি-পরিচয় জোরদার করে তোলার জন্য তারা যেন মোড় নিয়েছে নূতন বাঁকে এবং সেখানে খ্রীস্টানী মিলছে অ-খ্রীস্টানের সঙ্গে, ঈশ্বরবাদী মিলছে সর্বপ্রাণবাদীর সঙ্গে। এই ধরনের মেলামেশার ফলে তাদের উপজাতি ধর্ম ও সংস্কৃতির ততটুকু পুনরুদ্ধারপ্রাপ্ত হচ্ছে যতটুকু নাকি কালধর্মের সঙ্গে কদম মিলিয়ে চলার মতো।
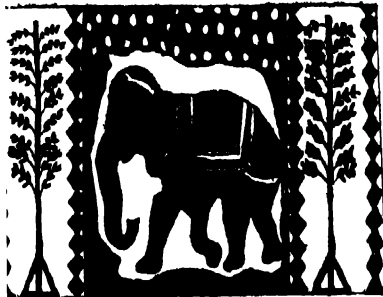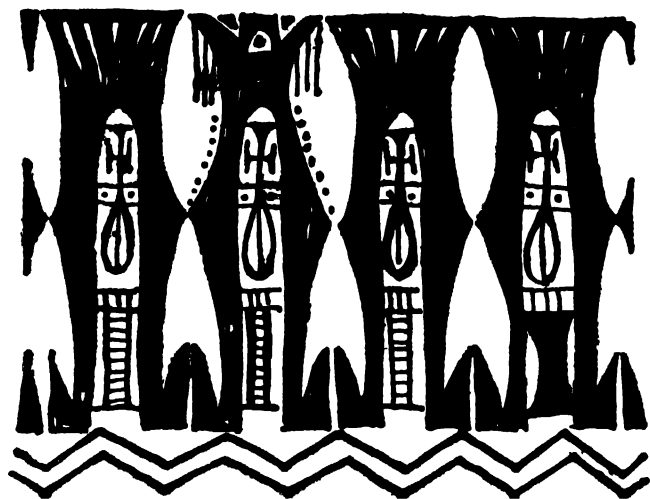
শিল্পকলা, সংগীত ও নৃত্য

ভারতের উপজাতিদের অনেক গান ও গল্প নৃবিজ্ঞানীরা লোক-গোচরে এনেছেন। শরৎচন্দ্র রায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম ও পুরোধা। তিনি ১৯১২ সালে 'দ্য মুণ্ডাস্ অ্যাণ্ড্ দেয়ার কান্ট্রি' বলে যে-বই প্রকাশ করেন তাতে তিনি অনেকগুলি মুণ্ডারি গান ও তার ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছিলেন। তা থেকে দুটি গান এবং অন্য সংগ্রহ থেকে আর-একটি গান নীচে তুলে দেওয়া হল। লিরিকধর্মী কবিতা হিসাবে পড়লেও এই-সব গানের রসমাধুর্য কতখানি স্পষ্ট বোঝা যায় :

গাছের গায়ে জড়িয়ে যেমন কুন্দুরু লতা লো,
তেমনি আমায় জড়ালি রে পীরিতেরি ডোরে—
ওলো মেয়ে, ও আমার পীরিতেরি মেয়ে।
কুন্দুরু দু হাত দিয়ে যেমন বাঁধে গাছ
তেমন আমায় বাঁধলি বাহুর ডোরে—

ওগো মেয়ে, ও আমার পীরিতেরি মেয়ে।
যেমন গাছ ঘিরে থাকে পালাণ্ডু লতা লো—
তেমনি ঘিরে আছিস আমার বুকে,
ওলো মেয়ে, ও আমার পীরিতেরি মেয়ে।
যেমন গাছ পাকে পাকে জড়ালে পালাণ্ডু
তেমনি তোর বুকের সাথে জড়ালি মোর বুক,
ওলো মেয়ে, ও আমার পীরিতেরি মেয়ে।
নরম লাগে গরম লাগে বুকের মাঝে বুক
আয় না চলে ও কুন্দুরু আমার সাথে আয়,
ওলো মেয়ে, ও আমার পীরিতেরি মেয়ে।
আসিস যদি চলব সাথে সারা জীবন ভোর
আমরা তুজন পা ফেলে রে চলব একই সাথে,
ওলো মেয়ে, ও আমার পীরিতেরি মেয়ে।
শীতল বুকে রাখিস্ যদি শীতল হবে বুক
জীবন পথে পা মিলিয়ে চলব রে দুই জনা,
ওলো মেয়ে, ও আমার পীরিতেরি মেয়ে।
ও পালাণ্ডু, ও কুন্দুরু, আয় রে চলে আয়
চলার পথে পা মিলিয়ে চলব হাতে হাত,
ওলো মেয়ে, ও আমার পীরিতেরি মেয়ে।[১]

[১] বাংলা লিপ্যন্তরে মুণ্ডারি গান :
কুচা মুচা কুন্দুরু
কুচা কোতোং তাদিংগা কুন্দুকম।
কুচা কোতোং তাদিংগা নাইবি।
নাটিন নাটিন পালাম্ভম নাটিন,
কোদোং তাদিংগা পালান্তম নাটিন,
কোতোং তাদিংগা নাইরি।
জীবারে সুকুজানরে দো দোলাং সেনোয়া
কুন্দুরু, দো দোলাং সেনোয়া, নাইবি।
কুরমতারে বেরাজানরে
মারে দোলাং বিরিদা, পালাস্তু,
মারে দোলাং বিরিদা, পালাস্তু॥

এই প্রণয়ী যুগলের কাছে জগৎ সংসার সবই মিথ্যা— সত্য শুধু তারা দুজন ও তাদের প্রেম। তারা পরস্পরের সঙ্গ যদি পায় তো আর কিছুই চায় না। এদের মনে আশঙ্কা নেই, উৎকণ্ঠা নেই। তাদের প্রেমের পথে সামান্য বাধা সৃষ্টি করলেও সে তারা সইতে পারে না। মুণ্ডা তরুণ সমাজের বিধি-নিষেধ কেমন গোঁয়ারের মতো তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়— তার নিদর্শন একটি উপস্থিত **করছি :**

ঘটকির্নী বুড়ির মুখ দেখব নারে আর
কেরকেটা ও কাকের সাথে দাও ভাগিয়ে তারে,
বউ করব পীরিত আমার সঙ্গে আছে যার
আমার মনই বলে দেবে বউ করব কারে।
নাইবা চড়ে গেলাম আমি পালকি-চৌদোলায়
নাইবা আমার পিছু গেল মাদল বাজিয়ে,
চলব আমি ভাব ভালাসে পরাণ যারে চায়
ইচ্ছা আমার চরণ দুটো নেবে চালিয়ে।
নাইবা দিলি জলের ছিটে আমের ডাল দিয়ে
কপালে মোর নাইবা সিঁদুর দিলি,
বউকে পাব মন যেখানে যাবে আমায় নিয়ে
যার সাথে মন মেলে আমার তার সঙ্গে মিলি।[১]

[১] বাংলা লিপান্তরে মুণ্ডারি গান :

কেরকেটা দূতামো কাইংগা
দেমচুয় দাবাবা কাইংগা।
আইন গেগো সালাজোমা
আইন গেগো পিত জোমা।
ডুগুমুগু চৌবল কাইংগা
মোলোং প্রিয়ো টিকা সিন্দুরি কাইংগা।
আইন গেগো সালাজোমা
আইন গোগো পিত জোমা॥

তৃতীয় গানটি অন্য জায়গা থেকে সংগৃহীত। এ-গানের ভাবটাও আলাদা :

ছেলে বলছে :

ঘর থেকে তুই বেরোতিস্ রে সদ্য ফোটা ফুল
চেকনাই তোর ছিল তখন ময়ূর পাখার মতো,
বাহার তোর গেল কোথায় একি চোখের ভুল
ঘুচে গেল ময়ূর পাখার রঙের জলুস যত ?

মেয়ে তার জবাব দিচ্ছে :

মিতে আমার জ্বলেনি রূপ প্রখর রবির তাপে
হয় নি মলিন মাটির পরশ পেয়ে।
মধুঋতু যায় রে চলে জানি না কার শাপে
বয়স গেল পথের পানে চেয়ে।

এগুলি যদিচ কবিতা হিসাবে পড়া গেল— আসলে এগুলি গান। এ-সব গানে যে ভাব ও আবেগ প্রকাশ পায়, এ-সব গানের তালে যে-সব নাচ নাচা হয়—সব-কিছু একত্র মিলে সরল উপজাতি-জীবনের সুখে দুঃখে একটা রসসঞ্চার করে। উপজাতিদের শিল্পরুচির আরো পরিচয় পাওয়া যায় তাদের গৃহসজ্জা, মেঝে ও দেয়ালের আলপনায়, তাদের কাপড়ে চোপড়ে এবং তাদের সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দরতর করার সাদাসিধে অলংকারে। উল্‌কি পরা তাদের রেওয়াজ। অধিক অঙ্গবাসের বালাই তারা রাখে না বলে এই-সব চিত্রবিচিত্র উল্‌কি সহজেই চোখে পড়ে। তারা তাদের কাপড় ছোপায় দিশি রঙে। এ-সব রঙে লুকানো ছুপানো কিছু নেই— সবই উজ্জ্বল কড়া রঙ ;— লালের সঙ্গে হলুদ, নীলের সঙ্গে সবুজ জমি, আর কুচকুচে কালো পাড়— এই রকম রঙের সমাবেশ তাদের খুব ভালো লাগে। কাপড়ে যে-সব নকশা থাকে— সে তাঁতে বোনা হোক্ কিংবা ছুঁচে তোলা হোক্— বেশির ভাগই জ্যামিতিক। বীজ দিয়ে কিংবা গুটি দিয়ে যে-সব মালা বানায় তার রঙের বাহার দেখবার মতো। কুচকুচে কালো খোঁপায় যে ফুলের গুচ্ছটি গোঁজে তাতে চুলের কালো

ও ফুলের রঙ— দুটিই যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অঙ্গসজ্জা যেমনই করুক-না কেন, শ্রীমণ্ডিত শ্যামল অঙ্গে সবই মানানসই হয়। তাদের প্রসাধনের এই সহজ সৌন্দর্য বেশি করে চোখে পড়ে যখন তারা উৎসব-অনুষ্ঠানে নাচতে আসে।

উপরে যতটুকু বলা হল ভারতের উপজাতিদের শিল্পরুচি বিষয়ে, তাতে কিন্তু সকল কথা বলা হল না। আর-একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে শিল্পকলার সঙ্গে তাদের ধর্মের অনুষ্ঠানের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখা যায়। ধর্মীয় যা কিছু তার সঙ্গে নিতান্ত সামাজিকের একটি যে স্বাতন্ত্র্য সভ্য সমাজ সচরাচর রক্ষা করে চলেন, উপজাতিসমাজে তেমন কোনো পার্থক্য করা হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে উপজাতিদের ধর্ম-ধারণায় দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা কিংবা বুদ্ধিবিচারের কোনো স্থান নেই। তাদের ধর্মধারণা স্বপ্ন দিয়ে গড়া, চোখে যা দেখা যায় না, তাই তারা দেখতে চায়, অন্তরের গভীরতা থেকে যে প্রত্যাদেশ তারা পায় তাই তাদের শাস্ত্র, তাদের মন্ত্র। অন্তরের মধ্যে এই যে অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার উৎস থাকে— তা যেমন তাদের ধর্ম-ধারণার মূলে, তেমনি হয়তো আত্মপ্রকাশেরও মূলে। যখন এই উৎসে অবগাহন স্নান করা যায়, ধর্মভাব ও শিল্পভাব এক হয়ে যায়, তখন দু'য়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না।

উপজাতিদের সকল ধর্মানুষ্ঠানেই ভূতাত্মার নামে কিছু উৎসর্গ করার বিধান আছে। সেখানে তাঁদের স্থান, সেই-সব জায়গায় তারা নিবেদন করে পোড়ামাটির তৈরি পুতুল— হাতি, ষাঁড়, ঘোড়া, শুয়োর। ওদেরই মধ্যে যারা পুরুত শ্রেণীর, এ-সব পুতুল গড়ায় তারা সুদক্ষ। কখনো কখনো পুতুল তৈরি হয় কাঠ খুঁদে অথবা সেই আদ্যিকালের ঢোক্‌রা প্রথায় পিতল গলিয়ে। মানুষ কিংবা দেবদেবীর মূর্তি তারা কদাচিৎ গড়ে। কিন্তু যে-সব অঞ্চলে মুখোশ-নৃত্যের চল আছে, সেখানে দেবতার মুখোশ যেমন তৈরি হয় তেমনি দানবের মুখোশও।

এই-সমস্ত মূর্তি বা মুখোশের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই

যে এগুলির কোনোটাই বাস্তবের অনুকৃতি নয়। হাতি হোক্ ষাঁড় হোক্, দেব হোক্ দানব হোক্— যে-গুণে যে বিশেষ, সেই গুণটুকুই উপজাতিদের চোখে বড়ো হয়ে দেখা দেয় এবং তাদের এই-সব শিল্পকর্মে তারা সেই বৈশিষ্ট্যটুকু দেখিয়েই খুশি, বাস্তব খুঁটিনাটিতে তারা তত মন দেয় না। আদিম জাতিদের শিল্পকলায় দৃশ্য বস্তুর আদি নিদানকে বিশেষভাবে প্রকাশ করার এই যে প্রবণতা, এ আমাদের মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। অন্যেরা যাকে কলাকৌশলহীন বলে মনে করতে পারে— তা নিয়ে তাদের কোনো সংকোচ নেই। দৃশ্য বস্তু তাদের মনে যেমন যেমন ছাপ রাখে তারা তা তেমন তেমন প্রকাশ করে। দৃশ্য বস্তুর গুণ বা প্রকৃতি নিয়ে তাদের কারবার, বাস্তব নিয়ে নয়। এইজন্য উপজাতিদের শিল্পকলাকে শিল্পসৃষ্টি বলা চলে, কিন্তু সভ্য সমাজের কলাকৌশলকে কেবল কারসাজি মনে হয়। উপজাতি-শিল্পী শিল্পশিক্ষা করে নি, শিল্পে সে দীক্ষা লাভ করেছে।

পূর্বেই বলেছি মানুষের মুখ বা দেহাকৃতি নিয়ে উপজাতি-শিল্পীরা বড় একটা মাথা ঘামায় না। যখন তারা কোনো মুখ বা শরীর কাঠ কুঁদে বের করে— তখন বুঝতে হবে সে হল তাদের কোনো পরলোকগত প্রিয়জন। এই-সব মূর্তিতেও মৃতব্যক্তির আকৃতি কিংবা দেহসংস্থানের অবিকল নকল করার কোনো প্রয়াস দেখা যায় না। মোটামুটিভাবে নারী বা পুরুষের চেহারার একটা আদল আনলেই তারা তাদের আদরের ধনকে স্মরণীয় রাখার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করে। এই-সব মূর্তি তো লোক-দেখানো মূর্তি নয়, মূর্তিকারের লোকান্তরপ্রাপ্ত প্রিয়জনের স্মরণ-চিহ্ন মাত্র। তার নিজের কাছেই তার সমাদর।

এই-সব শিল্পকর্মের অর্ঘ্য — পোড়ামাটির পুতুল বা প্রদীপ তারা দেয়ালঘেরা মন্দিরের অভ্যন্তরে নিবেদন করে না, রেখে আসে কোনো গাছের তলায়, খোলা আকাশের নীচে। বছরের পর বছর যায়, গাছের তলায় অনেক পুতুল জমতে থাকে— অনেক শোকদুঃখের

প্রতীক চিহ্ন। বাইরের লোক দেখে গাছতলায় পড়ে আছে, যেমন তেমন ভাবে জড়ো করা অযত্নবিন্যস্ত একই ধরনের গাদা গাদা পুতুল, তারা বুঝতে পারে না এই-সব জিনিসের সঙ্গে স্থানীয় উপজাতিদের কত স্মৃতি বিজড়িত।

শিল্পকর্মে যেমন তাদের অবৈচিত্র্য— তাদের গানের সুর ও নাচের তালও তেমনি অজটিল। জীবনযাত্রা যেমন তাদের সহজ সরল তাদের আত্মপ্রকাশের ছন্দও তেমনি। গানে যেমন একই সুরের পুনরুক্তি, নাচের ছন্দেও তেমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের একই রকম গতি ও পদক্ষেপ। গানে যেমন নাচেও তেমনি, বিশেষজ্ঞ বা ওস্তাদ বলতে কেউ নেই— স্ত্রীপুরুষ, ছেলেমেয়ে সবাই প্রাণের স্ফূর্তিতে নাচে ও গায়। তাদের নাচ নৃত্য নয় যে একজন বা একাধিক মঞ্চে উঠে নাচবে এবং আর সবাই দর্শক সাধারণ হয়ে কেবল দেখবে, এ-নাচের মজা হল সবাই মিলে নাচবে, আপন মন মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে নাচবে।

উপজাতিদের শিল্পকর্ম সর্বসাধারণের শিল্পকর্ম। যারা এতে ভাগ নেয় তাদের দৈনন্দিন জীবন শিল্পময় হয়ে ওঠে। এমনিতে তাদের বস্তু বা চিত্তের অপ্রতুলতা হেতু তাদের জীবন অজটিল ও অবিচিত্র। এই-সমস্ত অভাব ছাপিয়েও যদি গানে, নাচে শিল্পকর্মে তারা ভাবের সঞ্চার করতে পারে— সেটাও কিছু কম কথা নয়।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি একবার কয়েক সপ্তাহের জন্য জুয়াং অঞ্চলে ছাউনি ফেলে তাদের মধ্যে ছিলাম। আদিবাসীদের মধ্যে জুয়াংদের মতো আদিম জাতি খুব কমই আছে। যে-গ্রামে আমি ছিলাম সেখানকার জুয়াংদের খুবই দুরবস্থা। একদিন এক ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে আমি এই গ্রামে যে দৃশ্য দেখেছিলাম সে আমার আজো স্মরণে আছে। আকাশে সেদিন চাঁদের আলো উছলে পড়ছে। সারা গাঁয়ের লোক সে-রাত ভোর নেচে কাটাল। সকাল হলে পর একে একে তারা তরুণ জুয়াংদের শয়নাগার-সংলগ্ন মাঠ ছেড়ে চলে গেল যে যার হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটতে। গাঁটা

ছিল একটি মালভূমির গভীরে, চারিদিকে তার উঁচু পাহাড় খাড়া হয়ে উঠেছে। সারা রাত ধরে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে মাদলের শব্দ বহুগুণিত হল, সেইসঙ্গে শোনা গেল বাঁশির সুর আর সমবেত গানের প্রতিধ্বনি।

সকালবেলা আমি জুয়াংদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, না ঘুমিয়ে নেচে গেয়ে সারাটা রাত তারা কাটায় কী করে। একটি বুড়ো গোছের জুয়াং আমায় বলল, 'সারাটা দিন হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটি বাবু। মনে ভারি বেজার লাগে। দিন ভোর কত দুখ সয়েছি— সেই ভেবে সারা রাত বেজার থাকি কোন্ দুখে? হয় কি না লয় তুই বল!' খুব খাঁটি কথা। আমার ধারণা মনের এই সঞ্জীবনী শক্তি আছে বলেই ভারতের উপজাতিরা দৈনন্দিন জীবনের বহু দুঃখ জয় করে উৎসব-অনুষ্ঠানে, শিল্পকলায়, সংগীতে ও নৃত্যে এমন অনাবিল আনন্দের আস্বাদ পায়।

শুদ্ধিপত্র

চিত্রসূচী (একবর্ণ ফটো চিত্র) ক্রমিক সংখ্যা 4, 5, 6, 'যুয়াং' স্থলে 'জুয়াং' হবে। ছবির শিরোনামাতেও অনুরূপ পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	ছত্র	ছাপার ভুল	সংশোধন
২	২	৬	রপাঙ্মুখ	পরাঙ্মুখ
৫	১	২	আগারিয়া	আগাড়িয়া
২১	৪	১	নেতৃত্ব	নৃতত্ত্ব
৩১	১	২	মালক চাষী	মালিক চাষী
৩৩	১	২	বসবাস	বনবাস
৩৪	১	২	হয	নয়
৪৩	৩	১	Berhors	Birhors
৪৪	৪	২	আগরিয়া	আগাড়িয়া
৪৫	১	৪	কুমার	কামার
৪৭	১	১	উঠ্‌লি	উঠ্‌লু
৪৮	২	৭	শশুপালন	পশুপালন
৫৩	৪	৭	বৃদ্ধি যত	যত বৃদ্ধি
৫৪	২	১০	সমানুভোজী	সহানুভোজী
৫৬	৩	৪	উৎপাদিত	উৎসাদিত
৬১	২	১৮	উপরটা	উপায়টা
৬৫	১	৯	উদার	উপায়
৬৬	১	১১	করছে	করবে
৬৭	৩	৭	কোনো কোনো	কোন্ কোন্
৬৭	৩	৮	সমৃদ্ধ	সিদ্ধ
৬৯	১	৭	একা	একত্র
৭১	৩	৮	অনুপাতে	অনুসারে
৭৪	১	৫	আমামের যোডো	আসামের বোডো

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	ছত্র	ছাপার ভুল	সংশোধন
৭৮	১	৬	সঙ্গে	মধ্যে
৮০	১	১৪	দেবেন	দেবে না
৮১	৪	৪	মাখেই	মাপেই
৮২	১	১	সেই সাদৃশ্য	সৌসাদৃশ্য
৮২	২	১২	সৌভ্রাত্র	সৌভ্রাতৃ
৯৪	৩	১	সেখানে	যেখানে
৯৬	৩	৩	চিত্তের	বিত্তের